জিরো: দ্য বায়োগ্রাফি অব অ্যা ড্যাঞ্জারাস আইডিয়া

মূল: চার্লস সিফ

অনুবাদ: আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

সূচিপত্র

অধ্যায় শূন্য: নাল অ্যান্ড ভয়েড

অধ্যায় এক: শূন্যের সূচনা

অধ্যায় দুই: পাশ্চাত্যে শূন্যের প্রত্যাখ্যান

অধ্যায় তিন: প্রাচ্যে শূন্যের আগমন

অধ্যায় চার: শূন্যের ধর্মতত্ত্ব

অধ্যায় পাঁচ: শূন্য ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব

অধ্যায় ছয়: শূন্যের অসীম বৈশিষ্ট্য

অধ্যায় সাত: শূন্যের ভৌত বৈশিষ্ট্য

অধ্যায় আট: শূন্য ও স্থান কালের সীমানা

অধ্যায় নয়: শেষ সময়

অধ্যায় শূন্য: নাল অ্যান্ড ভয়েড

ইউএসএস ইয়র্কটাউন জাহাজে শূন্যের আঘাতটা টর্পেডোর মতোই হলো।

১৯৯৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। জাহাজটি ভার্জিনিয়া উপকূল থেকে প্রমোদভ্রমণে বের হয়। শত কোটি ডলারের মিসাইল ক্রুজারটি কাঁপতে কাঁপতে থেমে যায়। ইয়র্কটাউন জাহাজের সলীল সমাধি ঘটল।

যুদ্ধজাহাজগুলো বানানো হয় টর্পেডো বা বিস্ফোরকের আঘাত সহ্য করতে পারার মতো শক্তিশালী করে। ইয়র্কটাউন জাহাজকে সব ধরনের অস্ত্র থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু শূন্য থেকে বাঁচানোর কথা কেউ ভাবেনি। মারাত্মক এক ভুল।

মাত্রই ইয়র্কটাউনের কম্পিউটারে নতুন এক সফটওয়্যার ইন্সটল করা হয়েছে। এটিই নিয়ন্ত্রণ করছে জাহাজের ইঞ্জিন। কিন্তু কোডের মধ্যে যে একটি টাইম বোমা লুকিয়ে আছে তা খেয়াল করেনি। সফটওয়্যার ইন্সটল করার সময় শূন্যটার দিকে প্রকৌশলীদের নজর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কী কারণে কে জানে, শূন্যটার দিকে তাকিয়ে দেখেনি। ফলে সেটি লুকিয়ে থাকল কোডের ভিড়ে। যতক্ষণ না সফটওয়্যার শূন্যটাকে মেমোরিতে নিয়ে আসল। তাতেই সব শেষ।

ইয়র্কটাউনের কম্পিউটার শূন্য দিয়ে ভাগ করার চেষ্টা করেছিল। সাথে সাথে ৮০ হাজার হর্সপাওয়ারের যান অকেজো হয়ে গেল। ইঞ্জিনকে জরুরি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আনতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগে গিয়েছিল। জাহাজটি পরে কোনোরকমে তীরে ভিড়তে সক্ষম হয়। শূন্য থেকে মুক্তি পাওয়া, ইঞ্জিন মেরামত করা ও ইয়র্কটাউনকে পুনরায় সচল করতে দুই দিন সময় লেগে গেল।

অন্য কোনো সংখ্যার দ্বারা এমন ক্ষতি করা সম্ভব নয়। ইয়র্কটাউনে ঘটা কম্পিউটারের ত্রুটি শূন্যের ক্ষমতার খুব ছোট্ট এক নমুনা। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ শূন্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। শূন্যের মুখোমুখি হলে দার্শনিকদের বিদ্যেবুদ্ধি লোপ পেত। কারণ শূন্য অন্য সংখ্যা থেকে একেবারেই আলাদা। অবর্ণনীয় ও অসীমের এক ছোট্ট বহিঃপ্রকাশ। এ কারণেই মানুষ একে ভয় পেয়েছে। ঘৃণা করেছে। নিষিদ্ধ করেছে।

এটা হলো শূন্যের গল্প। প্রাচীনকালে এর জন্মের কথা। প্রাচ্যে এর সাদরে গৃহীত হবার কথা। ইউরোপে স্বীকৃতি পাওয়ার সংগ্রাম। আর আধুনিক পদার্থবিদ্যায় এর নিত্যনতুন হুমকির কথা। এখানে বলা হয়েছে সেইসব পণ্ডিত, মরমিবাদী, বিজ্ঞানী ও পাদ্রীদের কথা যারা এই সংখ্যাটির অর্থ নিয়ে লড়াই করেছেন। প্রত্যেকেই বুঝতে চেয়েছেন। প্রাচ্যের ধারণাগুলো থেকে নিজেদেরকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে (কখনও কখনও সহিংস উপায়ে) মুক্ত রাখার পাশ্চ্যাতের একটি ব্যর্থ চেষ্টারও ইতিহাস এটি। এছাড়াও একটি সরল-দর্শন সংখ্যা থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন প্যারাডক্সেরও ইতিহাস এটি। বর্তমান শতাব্দীর সেরা বুদ্ধির মানুষগুলোও পেরে উঠছেন না এর সাথে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার পুরো অবকাঠামোকে হয়ত এই সংখ্যাটিই পরিষ্কার করবে।

শূন্যের অনেক ক্ষমতার কারণ এটি অসীমের যমজ। এরা সমান এবং বিপরীত। একের মধ্যে দুই। বিভ্রান্তির জন্ম ও কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে দুটোরই অবদান সমান। বিজ্ঞান ও ধর্মের বড় বড় প্রশ্নগুলো করা হয় শূন্যতা ও চিরন্ততা নিয়ে। শূন্যতা ও অসীমতা নিয়ে। শূন্য ও অসীম নিয়ে। শূন্য নিয়ে সংঘটিত যুদ্ধ দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত ও ধর্মের ভিত্তিতে আলোড়ন তুলেছিল। সব বিপ্লবের পেছনে কাজ করেছে শূন্য। আর অসীম।

প্রাচ্য ও পাশ্চ্যাতের সংঘাতের মূলে ছিল শূন্য। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংগ্রামের কেন্দ্রে ছিল শূন্য। শূন্য পরিণত হলো প্রকৃতির ভাষায়। হয়ে গেল গণিতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে ব্যাপক সমস্যাগুলোর সমাধানে মোকাবেলা করতে হয় শূন্যকে। হোক সে ব্ল্যাক হোলের অন্ধকার কেন্দ্র কিংবা বিগ ব্যাংয়ের উজ্জ্বল ঝলক।

কিন্তু ইতিহাসে পাতা বলছে, বাজিমাত সবসময় করেছে শূন্যই। প্রত্যাখ্যান, নির্বাসন সব মোকাবেলা করে শূন্য সবসময় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিয়েছে। মানুষ কখনোই শূন্যকে দর্শনে অন্তর্ভূক্ত হতে বাধ্য করতে পারেনি। বরং মহাবিশ্ব ও ঈশ্বরের ধারণা পেতে শূন্যের কাছেই যেতে হয়েছে মানুষকে।

অধ্যায় এক

কিছুই না করার গল্প

[শূন্যের সূচনা]

তখন অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কোনোটাই ছিল না। ছিল না স্থানের জগৎ, আর না ছিল তার বাইরের আকাশ। কে জাগাল? কোথায় জাগাল?

-ঋগ্বেদ

শূন্যের গল্প খুব পুরনো। গণিতের জন্মের সময়েই এর জন্ম হয়। সে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের কোথা। তখনও প্রথম সভ্যতারও জন্ম হয়নি। মানুষের লিখতে-পড়তে পারারও বহু আগের কথা। শূন্যকে আজ আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু প্রাচীনকালের মানুষের কাছে সংখ্যাটিকে বহিরাগত মনে হয়। ভীতিকর মনে হত।

ধারণাটির জন্ম প্রাচ্যের ফার্টাইল ক্রিসেন্ট১ বা উর্বর চন্দ্রকলা অঞ্চলে। খ্রিস্টের জন্মের কয়েক শ বছর আগে। এই শূন্য শুধু আদিম শূন্যতার প্রতিচ্ছবিই নয়। এর ছিল ভয়ানক গাণিতিক ধর্মও। শূন্যের মধ্যে রয়েছে যুক্তির ভিত্তিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার শক্তি।

গাণিতিক চিন্তার সূচনা ঘটেছিল ভেড়া গুণতে চাওয়ার ইচ্ছা থেকে। এছাড়াও সম্পদের হিসাব রাখতে ও সময় মাপতে গণিত লাগত। এগুলোর কোনোটাতেই শূন্যকে দরকার হয়নি। শূন্যের আবিষ্কারের আগেও হাজার বছর ধরে সভ্যতা ঠিকঠাক কাজ করছিল। শূন্যের পরটি ঘৃণা থেকে কিছু কিছু সংস্কৃতির মানুষ সংখ্যাটিকে বাদ দিয়েই বাঁচতে চেয়েছিল।

শূন্যবিহীন জীবন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শূন্যকে প্রয়োজন হয় না। কেউই শূন্যটি মাছ কিনতে যায় না। এক দিক থেকে সব অঙ্কবাচক সংখ্যার মধ্যে এটি সবচেয়ে সভ্য। চিন্তার পরিশীলিত রূপই আমাদেরকে সংখ্যাটি ব্যবহার করতে বাধ্য করেছে।

-আলফ্রেড নর্থ উইথহেড

একজন আধুনিক মানুষ শূণ্যবিহীন জীবনের কথা ভাবতেও পারেন না। ঠিক যেমনি ৭ বা ৩১ সংখ্যাগুলো ছাড়া জীবন চলা অসম্ভব। কিন্তু এক সময় শূন্য বলতে কোনো সংখ্যা ছিল না। ঠিক যেভাবে ছিল না ৭ বা ৩১। সেটা প্রাগৈতিহাসিক কালের কথা। তাই জীবাশ্মবিদরা পাথর ও হাড়ের টুকরো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গণিতের জন্মকাহিনি বের করেছেন। এসব থেকে গবেষকরা জেনেছেন, প্রস্তর যুগের গণিতবিদরা এখনকার গণিতবিদদের চেয়ে অমার্জিত ছিলেন। ব্ল্যাকবোর্ডের বদলে তারা ব্যবহার করতেন নেকড়ে।

১৯৩০ এর দশকে প্রস্তর যুগের গণিতবিদদের সম্পর্কে বড় একটি তথ্য মেলে। প্রত্নতত্ত্ববিদ কার্ল আব্লোসম চেকোস্লোভাকিয়ার মাটি নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি এ সময় ৩০ হাজার বছরের পুরনো একটি নেকড়ের হাড় খুঁজে পান। তাতে রয়েছে অনেকগুলো খাঁজ কাটা। কেউ জানে না, গুহামানব গগ এই হাড় দিয়ে তার শিকার করা হরিণ, আঁকা ছবি বা তার গোসল না করা দিনগুলো গুনেছিল কি না। তবে এটা নিশ্চিত, প্রাচীন মানুষেরা কিছু না কিছু গুনেছিল।

প্রস্তর যুগে নেকড়ের একটি হাড়ই বর্তমান সময়ের একটি সুপারকম্পিউটার। গগের আদিপুরুষরা তো দুই পর্যন্তুও গুণতে পারত না। সেখানে শূন্যের দরকার হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। মনে হচ্ছে গণিতের একেবারে শুরুর দিকে মানুষ শুধু এক ও বহুর পার্থক্য বুঝত। একজন গুহামানবের বর্শা হয় একটা থাকত, নাহয় বহু। তিনি একটি টিকটিকি খেতেন, বা বহু। এক বা বহু ছাড়া অন্য রাশিকে বোঝানোর মতো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। ধীরে ধীরে প্রাচীন ভাষাগুলো বিকশিত হলো। এক, দুই ও বহুর মধ্যে পার্থক্য পাওয়া গেল। শেষ পর্যন্ত এক, দুই, তিন ও বহুর পার্থক্যও জানা গেল। কিন্তু আরও বড় সংখ্যার কোনো নাম ছিল না। এই সমস্যা এখনও কিছু কিছু ভাষায় দেখা যায়। বলিভিয়ার সিরিয়না ইন্ডিয়ান বা ব্রাজিলের ইয়ানোয়ামাদের কথাই ধরুন। তাদের ভাষায় তিনের বেশি সংখ্যাকে প্রকাশ করার জন্য নেই কোনো শব্দ। তেমন দরকার হলে তারা বলেন “অনেক” বা “প্রচুর।”

কিন্তু সংখ্যার একটি দারুণ বৈশিষ্ট্যের কারণে সংখ্যাপদ্ধতি সেখানেই থেমে যায়নি। সংখ্যাদেরকে যোগ করে নতুন নতুন সংখ্যা পাওয়া যায়। তাই কিছুদিন পরেই বুদ্ধিমান মানুষগুলো সংখ্যা-শব্দগুলোকে বিভিন্ন সারিতে সাজাতে লাগল। বর্তমান ব্রাজিলের বাকাইরি ও বোরোরো জাতির মানুষের ব্যবহৃত ভাষায় এই কাজটি করা হয়েছে। তাদের সংখ্যাগুলো এ রকম: এক, দুই, দুই ও এক, দুই ও দুই, দুই ও দুই এবং এক ইত্যাদি। তারা দুইয়ের মাধ্মে হিসাব করে। গণিতবিদরা একে বলেন বাইনারি বা দ্বিমিক পদ্ধতি।

বাকাইরি বা বোরোরোদের মতো করে তেমন কেউ গণনা করেন না। প্রাচীন নেকড়ের হাড়ই প্রাচীনকালের গণনাপদ্ধতির আদর্শ উদাহরণ। গগের নেকড়ের হাড়ে ৫৫টি খাঁজ ছিল। প্রতি গ্রুপে ছিল ৫টি করে খাঁজ। প্রথম ২৫টি দাগের পরে দ্বিতীয় আরও একটি খাঁজ ছিল। মনে হচ্ছে, গগ হয়ত ৫ দিয়ে হিসাব করছিলেন। এবং গ্রুপগুলোকে ৫ দিয়ে গুচ্ছবদ্ধ করছিলেন। এটা করা খুবই অর্থবহ। দাগগুলোকে একটি একটি করে গণনা করার চেয়ে গ্রুপে গ্রুপে সাজিয়ে নিলে অনেক দ্রুত কাজ করা যায়। আধুনিক গণিতবিদরা বলবেন খোদাই শিল্পী গগ পাঁচভিত্তিক (quinary) গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু কেন পাঁচ-ই? গভীরে গিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যাবে আসলে যেকোনো একটি সংখ্যা নিলেই চলত। গগ চারটি নিয়ে গুচ্ছ করে দাগ টানলে এবং চার ও ষোলো এর গুচ্ছ বানালেও তার সংখ্যাপদ্ধতি ঠিকই কাজ করত। একইভাবে কাজ করত ছয় ও ছত্রিশের গুচ্ছও। কয়টা নিয়ে গুচ্ছ করা হলো সেটার ওপর হাড়ের ওপর দাগের সংখ্যা নির্ভর করে না। কিন্তু গগ চারের বদলে ৫টি নিয়ে গুচ্ছ করেছেন। পৃথিবীর সব মানুষই গগের বৈশিষ্ট্যটা পেয়েছে। মানুষের প্রতি হাতে পাঁচটি করে আঙ্গুল আছে। ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংখ্যাপদ্ধতির ভিত্তি হিসেবে ৫কে জনপ্রিয় হতে দেখা গেল। যেমন, প্রাথমিক যুগের গ্রিকরা ট্যালি চিহ্ন আঁকাকে বলত “ফাইভিং।”

এমনকি দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিমিক গণনা পদ্ধতিতেও ভাষাবিদরা পাঁচ ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতির সূচনা দেখেছেন। বোরোরো ভাষায় “দুই ও দুই এবং এক” বলার আরেকটি উপায় হলো “এটা হলো আমার এই পুরো হাতের সমান।” বোঝাই যাচ্ছে, প্রাচীন আমলের মানুষ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে গণনা করতে চাইত। পাঁচ (এক হাত), দশ (উভয় হাত) এবং বিশ (উভয় হাত ও উভয় পা) ছিল খুব পছন্দনীয় চিহ্ন। ইংরেজি ভাষার ইলেভেন (এগারো) ও টুয়েলভ (বারো) শব্দ দুটি মনে হচ্ছে “ওয়ান ওভার টেন” ও “টু ওভার টেন” থেকে এসেছে। আর তের (থার্টিন), চৌদ্দ (ফোর্টিন), পনের (ফিফটিন) ইত্যাদি হলো যথাক্রমে “থ্রি অ্যান্ড টেন”, “ফোর অ্যান্ড টেন” এবং “ফাইভ অ্যান্ড টেন” এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এ কারণে ভাষাবিদরা মনে করছেন, যে জার্মানীয় আদিভাষাসমূহ থেকে ইংরেজি ভাষা এসেছে সেগুলোতে দশ ছিল মৌলিক একক। এ কারণে সেই ভাষাগুলোর মানুষরাও ১০-ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতি ব্যবহার করতেন। অন্য দিকে ফরাসি ভাষায় আশিকে বলে *কোয়াত্রে ভিংত* (চারটি বিশ)। আর নব্বইকে বলে *কোয়াত্রে ভিংত দি* (চারটি বিশ ও একটি দশ)। হয়ত এখনকার ফ্রান্সে যে মানুষগুলো বাস করতেন তারা ২০-ভিত্তিক বা ভিজেসিনাল সংখ্যাপদ্ধতি ব্যবহার করতেন। সাত ও ৩১-এর মতো সংখ্যাগুলো এই সবগুলো সংখ্যাপদ্ধতিতেই ছিল। হোক সেটা ৫-ভিত্তিক, ১০-ভিত্তিক, কিংবা ২০-ভিত্তিক। কিন্তু এগুলোর কোনোটিতেই ছিল না শূন্যের জন্যে কোনো নাম। এই ধারণাটারই অস্তিত্ব ছিল না।

শূন্যটি ভেড়ার যত্ন তো কখনও নিতে হয় না। কিংবা শুন্যসংখ্যক সন্তানের হিসাব রাখার দরকার হয় না। “আমার কাছে শূন্যটি কলা আছে” না বলে দোকানী বলেন, “আমার কাছে কোনো কলা নেই।” কোনো কিছুর অভাব বোঝানোর জন্যে আপনার সংখ্যার প্রয়োজন হয় না। আর কোনো বস্তুর অভাবকে প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করার বিষয়টিও কারও মাথায় আসেনি। এ কারণেই শূন্য ছাড়াই মানুষ এতগুলো সময় পার করে দিয়েছে। শূন্যের দরকারই পড়েনি। শূন্যের উদয় তাই ঘটেনি।

সত্যি বলতে, প্রাগৈতিহাসিক কালে সংখ্যার জ্ঞান ছিল বড় এক গুণ। গুনতে পারা ছিল দারুণ মেধার পরিচায়ক। একে জাদুমন্ত্রের মতোই অতীন্দ্রিয় ও গুপ্ত মনে করা হত। মিশরীয় বই *বুক অব ডেড*-এ আকেন নামে এক নৌকার মাঝি বিদেহী আত্মাকে নদী পার করে নরকে পৌঁছে দেয়। তিনি একবার একটি মৃত আত্মার মুখোমুখি হন। এ সময় তিনি “তার আঙ্গুলের সংখ্যা জানে না” এমন কাউকে নৌকায় নিতে অস্বীকার করেন। মাঝিকে সন্তুষ্ট করতে তখন আত্মাকে আঙ্গুলের সংখ্যা বের করতে একটি গণনার ছড়া আওড়াতে হয়। (অবশ্য গ্রিক গল্পে মাঝি চাইত টাকা, যা মৃত ব্যক্তির জিহ্বার নিচে বাঁধা থাকত)।

প্রাচীন পৃথিবীতে গুনতে পারত হাতে গোনা কিছু মানুষ। তবে সংখ্যা ও গণনার মৌলিক ধারণাগুলো সবসময় মানুষ আয়ত্ত করে লিখতে-পড়তে পারার আগেই। আগেকার যুগের সভ্যতার মানুষ যখন খাগড়া দিয়ে মাটির লিপিতে লিখতে, পাথরে খোদাই করে ছবি আঁকতে ও পশুচর্ম ও প্যাপাইরাসে কালি দিয়ে লিখতে শুরু করে, তত দিনে সংখ্যাপদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মৌখিক সংখ্যাপদ্ধতিকে লিখিত আকারে উপস্থাপন করা খুবই সহজ কাজ ছিল। দরকার শুধু একটি সাঙ্কেতিক পদ্ধতি। যার মাধ্যমে লেখকরা সংখ্যাকে আরও স্থায়ী রূপ দিতে পারে। (কিছু কিছু সমাজের মানুষ তো লেখালেখি শেখার আগেই এই কাজটি করে ফেলেছে। যেমন নিরক্ষর ইনকারা কুইপু নামে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করত। এটা ছিল হিসাব করার জন্য বানানো একটি রঙিন ও গিঁট বাঁধা দড়ি।)

প্রথমদিকের লেখকদের লেখা সংখ্যাগুলোর সাথে তাদের সংখ্যাপদ্ধতির মিল থাকত। আর অনুমিতভাবেই তারা সেটা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উপায়ে লিখত। গগের সময়ের পরে সমাজ জীবনে উন্নতি সাধিত হয়েছে। একের পর এক ছোট ছোট দাগের গুচ্ছ না বানিয়ে লেখকরা প্রতিটি গুচ্ছের জন্যে প্রতীক তৈরি করল। পাঁচ-ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতিতে লেখক এক লেখার জন্যে হয়ত একটি দাগ দেবেন। পাঁচ এর একটি গুচ্ছ বোঝাতে আলাদা আরেকটি চিহ্ন ব্যবহার করবেন। ২৫ এর গুচ্ছ বোঝাতে ব্যবহার করবেন অন্য আরেকটি দাগ। এভাবেই চলবে।

মিশরীয়রা ঠিক এই কাজটিই করেছে। ৫ হাজার বছরেরও আগে, পিরামিডও তৈরির আগেই মিশরীয়রা তাদের দশমিক পদ্ধতিকে লেখায় রূপ দেওয়ার একটি নিয়ম তৈরি করে। সেখানে তারা ছবি দিয়ে সংখ্যা বোঝাত। একটি খাড়া দাগ দিয়ে এক একক বোঝানো হত। আবার গোড়ালির একটি হাড় দিয়ে বোঝানো হত ১০, একটি মোচড়ানো দড়ি ছিল ১০০ ইত্যাদি। এভাবে সংখ্যা লিখে যাওয়ার জন্যে তাদেরকে শুধু এই প্রতীকগুলোর গুচ্ছ রেকর্ড করতে হত। এক শ তেইশ বোঝানোর জন্যে ১২৩টি দাগ দেওয়ার বদলে লেখকরা ছয়টি প্রতীক লিখত। একটি রশি, দুটি গোড়ালি ও তিনটি খাড়া দাগ। প্রাচীনকালেই মূলত এভাবেই গাণিতিক কাজ হত। আর অন্য অনেক সভ্যতার মতোই মিশরেও শূন্য ছিল না। বা বলা যায়, প্রয়োজন হয়নি।

তবুও প্রাচীন মিশরীয়রা গণিতে ভালোই হাত পাকিয়েছিল। জ্যোতির্বিদ্যা ও সময় গণনায় তারা কারিশমা দেখিয়েছিল। তার মানে তাদেরকে উন্নত গণিত ব্যবহার করতে হয়েছিল। কারণ পঞ্জিকার পাতা খুব দ্রুত বদলে যায়।

বেশিরভাগ প্রাচীন মানুষের কাছেই একটি স্থিতিশীল পঞ্জিকা বানানো ছিল বড় এক সমস্যার কাজ। এর কারণ ছিল তারা সাধারণত চান্দ্র পঞ্জিকা দিয়ে কাজ শুরু করতেন। পরপর দুটি পূর্ণিমার মাঝের সময়টুকু ছিল এক মাস। এভাবে গণনা করাই ছিল সহজাত অভ্যাস। আকাশে চাঁদের বড়-ছোট হওয়া থেকে চোখ সরিয়ে রাখা ছিল কঠিন। আর সময়ের চক্র হিসাব করার জন্যে এ থেকে সুবিধাজনক একটি উপায়ও খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু চান্দ্র মাসের দৈর্ঘ্য হয় ২৯ থেকে ৩০ দিনের মাঝামাঝি। ১২টি মাস যোগ করে সব মিলিয়ে ৩৫৪ দিনের বেশি পাওয়া যায় না। যা সৌর বছরের চেয়ে ১১ দিন ছোট। তেরটি চান্দ্র মাস নিলে আবার ১৯ দিন বেশি হয়ে যায়। ওদিকে আবার চাষাবাদ নির্ভর করে সৌর বছরের ওপর, চান্দ্র বছর নয়। অসংশোধিত চান্দ্র মাস দিয়ে হিসাব করলে ঋতুর মাসগুলোকে বদলে যেতে দেখা যায়।

চান্দ্র মাসকে সংশোধন করাও আরেক মুশকিলের কাজ। সৌদি আরব ও ইসরায়েলসহ অনেকগুলো আধুনিক কালের দেশ এখনও পরিমার্জিত চান্দ্র পঞ্জিকা ব্যবহার করে। কিন্তু ৬ হাজার বছর আগে মিশরীয়রা আরও ভাল একটি সমাধান পেয়ে যায়। দিনের হিসাব রাখার তাদের পদ্ধতিটি ছিল অনেক সরল। সেই পঞ্জিকা ঋতুর সাথে মিল রেখে চলত অনেক দিন পর্যন্ত। সময়ের হিসাব রাখতে তারা চাঁদের বদলে সূর্যের ধারস্থ হয়। যেমনটা বর্তমানে বেশিরভাগ জাতি করেন।

চান্দ্র পঞ্জিকার মতোই তাদের মাস ছিল ১২টি। কিন্তু প্রতিটি মাস ছিল ৩০ দিনের। (১০-ভিত্তিক সংখ্যা ব্যবহার করায় তাদের এক সপ্তাহের দৈর্ঘ্য ছিল ১০ দিন। বছর শেষ হলে আরও বাড়তি পাঁচটি দিন যোগ করা হত। এতে করে সব মিলিয়ে ৩৬৫ দিন হয়ে যেত। এই পঞ্জিকাই আমাদের বর্তমান ক্যালেন্ডারের আদিরূপ। মিশরীয়দের এই পদ্ধতি গ্রিক ও পরে রোমানরা গ্রহণ করে। রোমানরা একে পরিমার্জন করে অধিবর্ষ যোগ করে। এটাই পরে পাশ্চাত্যে আদর্শ পঞ্জিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে মিশরীয়, গ্রিক ও রোমানদের কাছে শূন্যের ব্যবহার না থাকায় পশ্চিমা পঞ্জিকায়ও নেই শূন্য। এই অমনোযগই সহস্র বছর পরে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মিশরীয়দের সৌর পঞ্জিকার উদ্ভাবন ছিল দারুণ এক অগ্রগতি। তবে ইতিহাসের পাতায় তারা আরও গুরত্বপূর্ণ একটি অবদানের স্বাক্ষরও রাখে। জ্যামিতির জ্ঞান। শূন্য ছাড়াই মিশরীয় অল্প সময়ের মধ্যেই গণিতের বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। পাশেই একটি উত্তাল নদীর উপস্থিতিতে আসলে না হয়েও উপায় ছিল না। প্রতি বছর নীল নদের পানি উপচে পড়ে এর কূল ভাসিয়ে দিত। বদ্বীপে নেমে আসত বন্যা। একটি ভাল দিকও ছিল এর। উন্নত পলি এসে জমত কৃষি জমিতে। এর ফলে প্রাচীন পৃথিবীতে নীল বদ্বীপ হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে উর্বর কৃষিজমি। খারাপ দিকের মধ্যে ছিল সীমানার দাগ হারিয়ে যাওয়া। কৃষকরা বুঝতে পারতেন না কোনটা কার আবাদি জমি। মিশরে মালিকানাকে খুব গুরত্ব দেওয়া হত। মিশরীয় বই *বুক অব ডেড* পড়লে দেখা যায়, একজন মৃত মানুষকে ঈশ্বরের কাছে শপথ করে বলতে হয় যে সে প্রতারণা করে তার প্রতিবেশীর জমি দখল করেনি। এই পাপের শাস্তি ছিল এক ভয়ানক ভক্ষক প্রাণীকে পাপীর হৃদপিণ্ড খেতে দেওয়া। মিশরে চুরি করা ছিল শপথ ভাঙা, কাউকে হত্যা করা বা মন্দিরে স্বমৈথুনের মতোই কঠিন অপরাধ।

প্রাচীন ফেরাউনরা ক্ষয়ক্ষতি পরিমাপ ও নতুন করে সীমানা নির্দেশক স্থাপন করার জন্য জরিপ-আমিন নিয়োগ দিত। আর এভাবেই জন্ম জ্যামিতির। এই জরিপ-আমিন বা দড়ি প্রসারকরা (এটা বলা হত কারণ তারা পরিমাপের যন্ত্র ও গিঁট বাঁধা রশি দিয়ে সমকোণ বানাত) শেষ পর্যন্ত জমিকে আয়তক্ষেত্র ও ত্রিভুজে বিভক্ত করে ক্ষেত্রফল বের করার কায়দা বের করে। এছাড়া মিশরীয়রা পিরামিডের মতো বিভিন্ন বস্তুর আয়তন মাপার কৌশলও আয়ত্ত করে। পুরো ভূমধ্যসাগর এলাকায় মিশরীয় গণিত খ্যাতি অর্জন করেছিল। এবং সম্ভবত প্রাথমিক যুগের গ্রিক গণিতবিদরা, বিশেষ করে থ্যালিস ও পিথাগোরাসের মতো জ্যামিতিবিদরা মিশরে পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু মিশরীয়দের এতসব দারুণ জ্যামিতিক কর্ম সত্ত্বেও মিশরের কোথাও শূন্যের অস্তিত্ব ছিল না।

এর বড় কারণ, মিশরীয়া ছিল কড়া বাস্তববাদী। আয়তন এবং দিন ও ঘণ্টা পরিমাপের বেশি কিছু তারা করতে পারেনি। প্রয়োগ নেই এমন কোনো কিছুতে গণিত তারা কাজে লাগাত না। ব্যতিক্রম হলো জ্যোতিষবিদ্যা (astrology)২। এ কারণে মিশরের সেরা গণতিবিদরাও বাস্তব জগতের সাথে অসম্পর্কিত কোনো গাণিতিক সমস্যায় জ্যামিতির মূলনীতিকে কাজে লাগাতে পারতেন না। তারা তাদের গাণিতিক ব্যবস্থাকে বিমূর্ত যুক্তির কাঠামোতে রূপ দিতে পারেনি। গণিতকে দর্শনে স্থান দিতেও তাদের কোনো উদ্যোগ ছিল না। গ্রিকরা আবার এমন ছিল না। বিমূর্ত ও দার্শনিক যুক্তিকে তারা সাদরে গ্রহণ করেছিল। প্রাচীন গণিতকে তারাই সর্বোচ্চ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। তবুও তারা শূন্য আবিষ্কার করতে পারেনি। শূন্যে এসেছে প্রাচ্য থেকে। পাশ্চাত্য থেকে নয়।

শূন্যের জন্ম

সংস্কৃতির ইতিহাসে শূন্যের আবিষ্কার মানুষের অন্যতম বড় অর্জন হিসেবে সবসময় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

-টোবিয়াস ড্যানজিগ , *নাম্বার: দ্য ল্যাংগুয়েজ অব সায়েন্স*

মিশরীয়দের চেয়ে গ্রিকরা গণিতটা ভাল বুঝত। মিশরীয়দের থেকে জ্যামিতি শিখে নিয়ে অল্প দিনের মাথায়ই গ্রিকরা গুরুদেরকে ছাড়িয়ে যায়। শুরুতে গ্রিকদের সংখ্যাপদ্ধতি মিশরীয়দের মতোই ছিল। গ্রিকদের একটি ১০-ভিত্তিক গণনাপদ্ধতিও ছিল। দুই সংস্কৃতির সংখ্যা লেখার পদ্ধতিতেও পার্থক্য ছিল খুব সামান্য। সংখ্যা বোঝাতে মিশরীয়দের মতো ছবি ব্যবহার না করে গ্রিকরা ব্যবহার করল অক্ষর। H(ইটা)৩ মানে *হেকাটন* বা ১০০। M (মিউ) মানে *মিরিওরি* বা ১০,০০০। ইংরেজিতে যাকে বলে মিরিয়াড (myriad)। গ্রিক পদ্ধতিতে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় গুচ্ছ। পাঁচের জন্যেও তাদের একটি প্রতীক ছিল। যা থেকে বোঝা যাচ্ছে, তাদের পদ্ধতি ছিল পাঁচ ও দশ-ভিত্তিক পদ্ধতির মিশ্রণ। কিন্তু সার্বিকভাবে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত মিশরীয় ও গ্রিকদের লেখার কায়দা ছিল প্রায় একই। তবে মিশরীয় একই জায়গায় থেকে গেলেও গ্রিকরা আদিম এই পদ্ধতির উন্নতি করে আরও আধুনিক কৌশল আবিষ্কার করে।

মিশরীয়দের মতো দুটি আঁচড় দিয়ে ২ বা তিনটা H লিখে ৩০০ না বুঝিয়ে নতুন পদ্ধতিতে গ্রিকরা ২, ৩ , ৩০০ ও আরও বহু সংখ্যার জন্য (চিত্র ১) আলাদা আলাদা অক্ষর ব্যবহার করল। এ পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটে খৃষ্টপূর্ব ৫০০ সালের আগে। এ কৌশলের মাধ্যমে অক্ষরের পুনরাবৃত্তি ঠেকানো গেল। যেমন, ৮৭ লিখতে হলে মিশরীয় পদ্ধতিতে ১৫টি প্রতীক লাগত। আটটি গোড়ালি ও সাতটি খাড়া দাগ। গ্রিকদের নতুন পদ্ধতিতে সেখানে লেগেছে মাত্র দুটি প্রতীক। ৮০ এর জন্য Π এবং ৭ এর জন্য ζ। (রোমান পদ্ধতি এসে গ্রিক পদ্ধতিকে অপসারণ করে। কিন্তু রোমানদের পদ্ধতি এক ধাপ পেছনে গিয়ে মিশরীয়দের অনুন্নত পদ্ধতিই গ্রহণ করে। রোমান ৮৭, LXXXVIIলিখতে হলে সাতটি প্রতীক লাগে। অনেকগুলোই একাধিকবার এসেছে।)

গ্রিকদের পদ্ধতি মিশরীয়দের চেয়ে উন্নত হলেও প্রাচীনকালে লেখালেখির সবচেয়ে উন্নত কৌশল নয়। এ মর্যাদা পাবে প্রাচ্যের আরেকটি উদ্ভাবন। গণনার ব্যাবিলনীয় কৌশল। আর তাদের পদ্ধতির কারণেই শেষ পর্যন্ত প্রাচ্যে শূন্যের উদয় ঘটে। বর্তমান ইরাকের ফার্টাইল ক্রিসেন্ট অঞ্চলে।

প্রথমে দেখে ব্যাবিলনীয় পদ্ধতিকে এলোমেলো মনে হবে। প্রথমত, এটা হলো ৬০-ভিত্তিক পদ্ধতি। দেখতে-শুনতে খুবই অদ্ভুত ঠেকে। কারণ বেশিরভাগ সমাজেই তো ৫, ১০ বা ২০ ছিল ভিত্তি সংখ্যা। এছাড়া ব্যাবিলনীয়রা তাদের সংখ্যাগুলো প্রকাশ করতে মাত্র দুটি দাগ ব্যবহার করত। একটি কীলক দিয়ে ১ ও একটি ডাবল কীলক দিয়ে ১০। এই দাগ দুটিকে গুচ্ছ গুচ্ছ করে সাজানো হত। যোগফল হত ৫৯ বা তার কম। এই গুচ্ছগুলোই ছিল গণনার মৌলিক প্রতীক। ঠিক যেভাবে গ্রিকদের ছিল অক্ষর আর মিশরীয়দের ছিল ছবি। কিন্তু ব্যাবিলনীয় পদ্ধতির অদ্ভুত দিক এটি নয়। মিশরীয় ও গ্রিকদের যেখানে প্রতিটি প্রতীক দিয়ে আলাদা আলাদা সংখ্যা বোঝানো হত, সেখানে ব্যাবিলনীয়দের প্রতিটি প্রতীক দিয়ে অনেকগুলো আলাদা আলাদা সংখ্যা বোঝানো যেত। একটিমাত্র কীলক দিয়ে ১, ৬০, ৩৬০০ বা অন্য আরও অগণিত সংখ্যা প্রকাশ করা হত।

চিত্র ১

বিভিন্ন সংস্কৃতির সংখ্যা

আধুনিক চোখ এটা দেখে অবাক লাগলেও প্রাচীন মানুষের কাছে এটি ছিল খুবই অর্থবহ। এটা বলা যায় ব্রোঞ্জ যুগের কম্পিউটার কোড। অন্য অনেক সংস্কৃতির মতোই ব্যাবিলনীয়রাও গণনার কাজে সহায়তা করা যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত যন্ত্র হলো অ্যাবাকাস। যন্ত্রটা জাপানে *সরোবান*, চীনে *সুয়ান-পান*, রাশিয়ায় *স্কটি*, তুরস্কে *কুলবা*, আর্মেনিয়ায় *কোলেব* এবং অন্যান্য সংস্কৃতি আরও নানান নামে পরিচিত ছিল। অ্যাবাকাসে পিছলানো পাথর ব্যবহার করে সংখ্যার পরিমাণের হিসাব রাখা হত। (ক্যালকুলেট বা হিসাব করা, ক্যালকুলাস ও ক্যালসিয়াম সবগুলো শব্দই নুড়ি শব্দের ল্যাটিন রূপ *ক্যালকুলাস* থেকে আসা। )

পাথরকে উপরে-নীচে নড়াচড়া করেই যোগ করে ফেলা যেত অ্যাবাকাসে। ভিন্ন স্তম্ভের (কলাম) পাথরের সাংখ্যিক মান ছিল ভিন্ন। এগুলোকে নাড়িয়ে দক্ষ ব্যবহারকারী বড় বড় সংখ্যা খুব দ্রুত যোগ করা যেত। হিসাব শেষ হলে ব্যবহারকারীকে শুধু পাথরের সর্বশেষ অবস্থানের দিকে টাকাতে হত। এবার সেগুলোকে সংখ্যায় রূপান্তর করে নিলেই কেল্লাফতে!

ব্যাবিলনীয়দের সংখ্যা নিয়ে কাজ করার পদ্ধতিটি মাটির ফলকে অ্যাবাকাসকে প্রতীক দিয়ে লিখে ফেলার মতো। প্রতীকের প্রতিটি গুচ্ছ দিয়ে যে নির্দিষ্টসংখ্যক পাথর অ্যাবাকাসে নাড়ানো হয়েছে তা বোঝানো হত। আর অ্যাবাকাসের প্রতিটি কলামের মতোই অবস্থানের ওপর নির্ভর করে প্রতিটি গুচ্ছের আলাদা আলাদা সাংখ্যিক মান ছিল। এই দিক থেকে আমরা এখন যে পদ্ধতি ব্যবহার করি তা থেকে ব্যাবিলনীয় পদ্ধতি খুব আলাদা ছিল না। ১১১ এর প্রতিটি ১ এর মান ভিন্ন। ডান থেকে তাদের মান যথাক্রমে এক, দশ ও একশ। একইভাবে ^^^ এর তিনটি আলাদা অবস্থানে ^ এর মানে যথাক্রমে এক, ষাট ও ছত্রিশ শ। একটি সমস্যা বাদ দিলে এটাও ঠিক অ্যাবাকাসের মতোই ছিল। ব্যাবিলনীয়রা ৬০ লিখত কীভাবে? ১ লেখা তো সহজ। একটি কীলক (^)। দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো ৬০ ও লেখা হত এভাবেই। একমাত্র পার্থক্য হলো প্রথম অবস্থানের বদলে ^ থাকত দ্বিতীয় অবস্থানে। অ্যাবাকাস দিয়ে বোঝা যেত কোন সংখ্যাটি বোঝানো হচ্ছে। একটিমাত্র পাথর প্রথম কলামে আছে না দ্বিতীয় কলাম আছে তা তো দেখে সহজেই বোঝাই যায়। কিন্তু লিখতে গেলে? একটি লিখিত প্রতীক কোন কলামে ছিল তা লিখে বোঝানোর জন্যে ব্যাবিলনীয়দের কোনো পদ্ধতি ছিল না। ^ এর অর্থ হতে পারত ১, ৬০ বা ৩৬০০। সংখ্যাগুলো মিশ্রিত হলে ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। ^^ এর অর্থ হতে পারে ৬১, ৩৬০১ বা ৩৬৬০ বা আরও বড় কিছু।

এ সমস্যার সমাধান হলো শূন্য। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৩০০ সালের দিকে ব্যাবিলনীয়রা অ্যাবাকাসের খালি কলাম বা ফাঁকা স্থান বোঝাতে বাঁকানো কীলক (<) ব্যবহার করতে শুরু করে। এর মাধ্যমে বোঝা যেত একটি প্রতীক কোন অবস্থানে আছে। শূন্য আসার আগে ^^ কে ৬১ও বলা যেত, ৩৬০১ ও বলা যেত। কিন্তু শূন্য আসার পরে ^^ দিয়ে বোঝাল ৬১ আর ৩৬০১ লেখা হত ^<^।(চিত্র ২)। ব্যাবিলনীয় অঙ্কের নির্দিষ্ট ক্রমকে অনন্য ও স্থায়ী অর্থ প্রদান করতে শূন্যের জন্ম হয়। শূন্য খুব কাজে আসল। কিন্তু এর ছিল শুধুই স্থানীয় অবস্থান। অ্যাবাকাসের ফাঁকা স্থান ব্যবহার করার জন্যই শুধু একে ব্যবহার করা হলো। অ্যাবাকাসের যে কলামে সবগুলো পাথর নীচে পড়ে থাকত সে কলামের জন্যে। অন্য অঙ্কগুলোকে সঠিক জায়গায় বসানো নিশ্চিত করার চেয়ে তেমন বেশি কোনো ছিল না শূন্যের। এর নিজস্ব কোনো সাংখ্যিক মান ছিল না। আর যাই হোক, ০০,০০,২১,৪৮ আর ২১৪৮ তো একই সংখ্যাই। এক গুচ্ছ অঙ্কের মধ্যে শূন্যের বাঁয়ে কোনো অঙ্ক থাকলে তবেই শূন্য অর্থবহ হয়। এর নিজস্ব বলতে আছে ... শূন্য। শূন্য ছিল একটি অঙ্ক, সংখ্যা নয়। এর কোনো মান ছিল না।

চিত্র ২

ব্যাবিলনীয় সংখ্যা

একটি সংখ্যার মান পাওয়া যায় সংখ্যারেখায় এর অবস্থান থেকে। অন্য সংখ্যাদের সাপেক্ষে এর অবস্থান তুলনা করে। যেমন, ২ সংখ্যাটি আসে ৩ এর আগে এবং ১ এর পরে। অন্য কোথাও এর কোনো অর্থ থাকবে না। কিন্তু সংখ্যারেখায় শূন্যটি দাগের জন্য শুরুতে কোনো অবস্থান ছিল না। এটা ছিল শুধু একটি প্রতীক। সংখ্যাদের ক্রমবিন্যাসে এর জন্যে কোনো স্থান ছিল না। এমনকি এখনও আমরা শূন্যকে অনেকসময় অসংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করি। যদিও আমরা সবাই জানি, শূন্যের আছে একটি সাংখ্যিক মানও। শূন্যের সাংখ্যিক মান না বুঝিয়েও একে স্থান নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করি। টেলিফোন বা কম্পিউটার কিবোর্ডের দিকেই তাকিয়ে দেখুন না। ০ আছে ৯ এর পরে। ১ এর আগে নয়, যেখানে এর থাকার কথা। স্থান নির্দেশক ০ কোথায় বসল তাতে কিছু আসে যায় না। সংখ্যার ক্রমবিন্যাসে এটি যেকোনো জায়গায়ই বসতে পারে। কিন্তু এখন সবাই জানে, শূন্য আসলে সংখ্যারেখার যেকোনো এক জায়গায় বসলে হবে না। কারণ এর নিজস্ব একটি নির্দিষ্ট সাংখ্যিক মান আছে। এটিই ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য করে। এটি একটি জোড় সংখ্যা। আর এটি ১ এর আগের পূর্ণ সংখ্যা। সংখ্যারেখায় শূন্যকে এর উপযুক্ত জায়গায় স্থান দিতে হবে। ১ এর আগে এবং ঋণাত্মক ১ এর পরে। অন্য কোথাও সংখ্যাটি অর্থপূর্ণ হয় না। তবুও কম্পিউটারে শূন্যের অবস্থান সবার শেষে। আর টেলিফোনে সবার নীচে। কারণ আমরা গুণতে শুরু করি ১ থেকে।

দেখে মনে হয় গণনা শুরুর জন্যে এক-ই উপযুক্ত সংখ্যা। কিন্তু সেটা করলে শূন্য চলে যাচ্ছে অস্বাভাবিক এক জায়গায়। মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার মায়ান জাতিসহ বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এক দিয়ে শুরু করাকে স্বাভাবিক মনে করা হত না। মায়ানদেও একটি সংখ্যাপদ্ধতি ও পঞ্জিকা ছিল। সেটি আমাদের পদ্ধতির চেয়েও বেশি অর্থবহ ছিল। ব্যাবিলনীয়দের মতোই মায়ানদের ছিল অঙ্ক ও স্থানের স্থানীয় মান পদ্ধতি। একমাত্র পার্থক্য হলো, যেখানে ব্যাবিলনীয়দের সংখ্যার ভিত্তি ছিল ৬০, মায়ানদের সেখানে ভিত্তি ছিল ২০। তারও আগে প্রচলিত ১০-ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতির ধারণা এতে কাজে লাগানো হয়েছিল। ব্যাবিলনীয়দের মতোই তাদেরও প্রতীত অঙ্কের অর্থ খেয়াল রাখার জন্যে একটি শূন্যের দরকার পড়েছিল। আরও মজার ব্যাপার হলো, মায়ানদের দুই ধরনের অঙ্ক ছিল। সরল রূপে ছিল শুধু বিন্দু আর রেখা। আর জটিল রূপটি বানানো হয়েছিল অদ্ভুতদর্শন মুখাবয়বের গ্লিফ (glyph)দিয়ে। আধুনিক চোখে আপনার কাছে মায়ানদের লিখিত গ্লিফকে ভিনগ্রহের প্রাণীর মুখের মতোই মনে হবে (চিত্র ৩)।

মিশরীয়দের মতো মায়ানদেরও দারুণ একটি সৌর পঞ্জিকা ছিল। গণনাপদ্ধতি ২০-ভিত্তিক হওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই তারা বছরকে ২০ দিন মেয়াদের ১৮টি মাসে বিভক্ত করেছিল। যোগ করলে যা হয় ৩৬০ দিন। বছর শেষে উয়ায়েব নামে বিশেষ পাঁচটি দিন যোগ করে ৩৬৫ বানানো হত। কিন্তু মিশরীয়দের না থাকলেও মায়ানদের গণনাপদ্ধতিতে একটি শূন্য ছিল। ফলে তারা যা করার তাই করল। তারা শূন্য থেকে দিনের হিসাব করা শুরু করল। জিপ মাসের প্রথম দিনকে বলা হত জিপের ইন্সটলেশন বা সংস্থাপন। পরের দিনকে বলা হত ১ জিপ। তার পরে ২ জিপ। এভাবেই চলত ১৯ জিপ পর্যন্ত। পরের দিনকে বলা হত জৎয বা ০ জৎযের সংস্থাপন। এর পরে আসত ১ জৎয, ২ জৎয ইত্যাদি। প্রতি মাসে ছিল ২০টি দিন। যাদেরকে ০ থেকে ১৯ পর্যন্ত সূচিত করা হত। এখন আমরা যেভাবে লিখি তেমন ১ থেকে ২০ নয়। (মায়ান পঞ্জিকা বিস্ময়কর রকম জটিল ছিল। এই সৌর পঞ্জিকার সাথে একটি অনুষ্ঠানধর্মী পঞ্জিকাও ছিল। এতে ছিল ২০টি সপ্তাহ। প্রতি সপ্তাহে ১৩ দিন। সৌর বছরের সাথে সমন্বিতভাবে এই পঞ্জিকাটি একটি চক্র তৈরি করে। ৫২-বছর দীর্ঘ এই চক্রের পতি দিনের জন্যে ছিল আলাদা আলাদা নাম।)

চিত্র ৩

মায়ান সংখ্যা

বর্তমান পাশ্চাত্য ব্যবস্থার চেয়ে মায়ান পদ্ধতি বেশি অর্থপূর্ণ ছিল। পাশ্চ্যাত্যে পঞ্জিকা তৈরির সময় শূন্য ছিল না। এ কারণে আমরা শূন্য দিন বা শূন্য বছর দেখি না। আপাতদৃষ্টিতে শূন্যকে বাদ দেওয়ার কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া আছে বলে মনে করা হয় না। অথচ এর ফলেই কিন্তু অনেক সমস্যা হয়েছে। শূন্য না থাকার কারণে সহস্রাব্দের সূচনা নিয়ে বিতর্ক বাঁধে। একবিংশ শতকের প্রথম বছর কি ২০০০ নাকি ২০০১ তা নিয়ে মায়ানদের বিতর্ক করা লাগত না। কিন্তু আমাদের পঞ্জিকার সূচনা মায়ানরা করেনি। করেছে মিশরীয়রা ও পরে রোমানরা। এ কারণে আমরা সমস্যাময় শূন্যবিহীন পঞ্জিকায় আটকে আছি।

মিশরীয় সভ্যতায় শূন্য না থাকার ব্যাপারটা পঞ্জিকা ও ভবিষ্যৎ পাশ্চাত্য গণিতের জন্য খারাপ ফল বয়ে আনে। আসলে গণিতের জন্যে মিশরীয় সভ্যতা একের বেশি উপায়ে নেতিবাচক। শুধু শূন্যের অভাবই ভবিষ্যতের জন্যে সমস্যা তৈরি করেনি। ভগ্নাংশ নিয়েও কাজ করার ভাল কোনো উয়াপ্য তারা বের করতে পারেনি। এখন আমরা ৩/৪ কে যেমন চারভাগের তিন ভাগ মনে করি তারা সেভাবে দেখত না। তারা একে নিছক ১/২ ও ১/৪ এর যোগফল হিসেবে দেখত। ২/৩ ছাড়া সব ভগ্নাংশকে মিশরে 1/n আকারে সংখ্যার যোগফল আকারে লেখা হত। (যেখানে n একটি গণনাসংখ্যা বা স্বাভাবিক সংখ্যা, মানে ১, ২, ৩, ... ইত্যাদি)। 1/n কে বলা হত তথাকথিত একক ভগ্নাংশ। এই একক ভগ্নাংশদের বিশাল সারির কারণে মিশরীয় (ও গ্রিক) সংখ্যাপদ্ধতিতে অনুপাত নিয়ে কাজ করা ছিল দারুণ কঠিন এক কাজ।

এই অসুবিধাজনক পদ্ধতি শূন্য আসার পর পুরনো হয়ে গেল। ব্যাবিলনীয় পদ্ধতিতে শূন্য ছিল। ফলে ভগ্নাংশ লেখা সহজ হয়ে গেল। আমরা ১/২ কে ঠিক যেভাবে ০.৫ লিখতে পারি বা ৩/৪ কে ০.৭৫, একইভাবে ব্যাবিলনীয়রা ১/২কে লিখত ০;৩০, ৩/৪কে লিখত ০;৪৫। (আসলে ভগ্নাংশ নিয়ে কাজ করতে ব্যাবিলনীয়দের ৬৯-ভিত্তিক পদ্ধতি আমাদের আধুনিক ১০-ভিত্তিক পদ্ধতির চেয়ে বেশি সুবিধাজনক।)

দূর্ভাগ্যের বিষয় হলো, রোমান ও গ্রিকরা শূন্যকে ঘৃণা করত। সে ঘৃণা এতটাই যে তারা ব্যাবিলনীয়দের পদ্ধতিতে না গিয়ে মিশরীয়দের প্রতীকে পড়ে রইল। যদিও ব্যাবিলনীয় পদ্ধতি ছিল সহজ। জ্যোতির্বিদ্যার সারণি বানানসহ নানান কাজে জটিল হিসেব-নিকেশ করা দরকার হয়। গ্রিক পদ্ধতি এতই জটিল ছিল যে গণিতবিদরা একক ভগ্নাংশগুলোকে ব্যাবিলনীয় ৬০-ভিত্তিক সংখ্যায় রূপান্তর করত। তারপর হিসেব শেষ করে প্রাপ্ত সংখ্যাকে আবার গ্রিক রূপ দান করত। চাইলেই তারা অনেক সময় বাঁচাতে পারত। (ভগ্নাগশকে বারবার রূপান্তর করতে কেমন মজা তা সবাই জানি) কিন্তু গ্রিকরা শূন্যকে এতই ঘৃণা করতে যে তারা একে তাদের সংখ্যাপদ্ধতিতে স্থান দিতে অস্বীকার করে। যদিও সুবিধা সম্পর্কে জানত। কারণ হলো, শূন্য ছিল ভয়ানক।

শূন্যের ভয়ানক বৈশিষ্ট্য

সবচেয়ে আগের সময়ে বাস করত ইমির। ছিল না জল বা স্থল। বা কোনো নোনা তরঙ্গ। ছিল না নভোমণ্ডল বা ভূমণ্ডল। ছিল শুধু হাঁ করে থাকা শূন্যতা। কোথাও ছিল না সবুজের বিস্তার।

-দ্য এলডার এডা

সংখ্যাকে আবার মানুষ ভয়! এটা কল্পনা করাও কঠিন। তবুও শূন্যতা বা অনস্তিত্বের সাথে শূন্যকে জোর করে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলা ছিল ভয়ের বড় একটি কারণ। শূন্য নিয়েও ছিল ভয়।

বেশিরভাগ প্রাচীন মানুষ মনে করত, মহাবিশ্বের জন্মের আগে ছিল শুধু শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলা। গ্রিকরা বলত, শুরুতে অন্ধকার ছিল সবকিছুর জনক। অন্ধকার থেকে এল বিশৃঙ্খলা। অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলা থেকে জন্ম হয় বাকি সব সৃষ্টির। হিব্রু সৃষ্টি পুরাণে আছে, ঈশ্বর আলো ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করার আগে পৃথিবী ছিল বিশৃঙ্খল ও ফাঁকা। (হিব্রু কথাটি হলো *তোহু ভ বহু।* রবার্ট গ্রেভসের মতে এই *তোহু* শব্দের সাথে *তেহমত* শব্দটি জড়িত। তেহমত হলো একটি সেমেটীয় ড্রাগন, যা মহাবিশ্বের জন্মের সময় উপস্থিত ছিল। এর দেহ থেকে আসে পৃথিবী ও আকাশ। আর *বহু*র সাথে সম্পর্ক ছিল *বেহমত*-এর, যা হলো হিব্রু রূপকথার বিখ্যাত দানব।)প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যে একজন স্রষ্টার কথা বলা হয় যিনি বিশৃঙ্খলার মাখনকে মন্থন করে পৃথিবী সৃষ্টি করেন। নর্স পুরাণে আছে একটি উন্মুক্ত শূন্যতার কথা, যা বরফ দিয়ে আবৃত হয়। আর আগুন ও বরফের মিশ্রণ থেকে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা থেকে জন্ম হয় আদি দানবের। মহাবিশ্বের আদিম ও সহজাত অবস্থা ছিল শূন্য ও বিশৃঙ্খল। সময়ের সমাপ্তিতে শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলা আবার ফিরে আসার ভয় সবসময় তাড়া করে ফিরত। শূন্য ছিল সেই শূন্যতারই প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু শূন্যের ভয় শূন্যতা নিয়ে অস্বস্তির চেয়ে বেশি হয়ে গেল। প্রাচীন মানুষের কাছে শূন্যের গাণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল ব্যাখ্যার অতীত। যেমনিভাবে মহাবিশ্বের জন্ম ছিল রহস্যের চাদরে ঢাকা। এর কারণ শূন্য অন্য সংখ্যা থেকে আলাদা। ব্যাবিলনীয় পদ্ধতির অন্য সংখ্যার মতো শূন্যের কখনও নিজস্ব মর্যাদা ছিল না। এর কারণটাও যথাযথ ছিল। নিঃসঙ্গ শূন্যের আচরণ ভাল নয়। কম করে বললেও, এটি অন্য সংখ্যার মতো আচরণ করে না।

একটি সংখ্যাকে নিজের সাথে যোগ করুন। এটি পাল্টে যাবে। একের সাথে এক যোগ করলে এক হয় না। হয় দুই। দুইয়ের সাথে দুই যোগ করলে হয় চার। কিন্তু শূন্যের সাথে শূন্য যোগ করলে শূন্যই থাকে। এটি আর্কিমিডিসের উপপাদ্য মেনে চলে না, যা সংখ্যার মৌলিক একটি নীতিমালা। উপপাদ্যটি বলছে, কোনো কিছুকে যথেষ্টসংখ্যক বার নিজের সাথে যোগ করলে এটি মানের দিক দিয়ে সকল সংখ্যার চেয়ে বড় হয়ে যাবে। (আর্কিমিডিসের উপপাদ্যকে প্রকাশ করা হয়েছিল ক্ষেত্রফলের মাধ্যমে। দুটো অসমান ক্ষেত্রফলের পার্থক্যকে একটি সংখ্যা মনে করা হত) কিন্তু শূন্য তো কখনও বড় হয় না। এটি অন্য সংখ্যাকেও বড় করতে পারে না। দুই ও শূন্য যোগ করলে শূন্যই থাকে। যেন আপনি সংখ্যার যোগ করাকেই থোড়াই কেয়ার করছেন। বিয়োগ করলেও ঘটে একই কাণ্ড। দুই থেকে শূন্য বিয়োগ করলেও দুই-ই পাচ্ছেন। শূন্যের যেন কোন দাম নেই। তবু এই দামহীন সংখ্যাই গুণ ও ভাগের মতো গণিতের সবচেয়ে সরল কাজগুলোকে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়।

সংখ্যার জগতে গুণ হলো এক ধরনের প্রসারণ। আক্ষরিক অর্থেই বলছি। মনে করুন, সংখ্যারেখা হলো একটি রবারের ফিতা। যার গায়ে বিভিন্ন দাগ দেওয়া আছে। (চিত্র ৪) দুই দিয়ে গুণ করা মানে ফিতাকে দুই গুণ প্রসারিত করা। আগে যে দাগটি এক ছিল, এখন সেটি দুই। আগে যে দাগটি তিন নম্বর অবস্থানে ছিল, এখন তার অবস্থান ছয়। একইভাবে একর অর্ধেক দিয়ে গুণ করা মানে ফিতাটাকে একটু শিথিল করা। আগে যে দাগটি ছিল দুই নং অবস্থানে, এখন সেটি আছে এক নং অবস্থানে। আগে যে দাগটি ছিল তিনে, এখন সেটি আছে দেড়ে। কিন্তু শূন্য দিয়ে গুণ করলে কী হবে?

চিত্র ৪

রবারের গুণের ফিতা

যেকোনো কিছুকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্য হয়। ফলে সবগুলো দাগ চলে আসে শূন্যতে।

রবারের ফিতা শেষ। পুরো সংখ্যারেখাই শেষ।

দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, এই অপ্রিয় সত্যকে এড়ানোর কোনো উপায় নেই। যেকোনো কিছুকে শূন্য দিয়ে গুণ করলেই শূন্য হয়। এটা আমাদের সংখ্যাপদ্ধতির একটি নিয়ম। দৈনন্দিন সংখ্যাগুলোকে অর্থবহ হতে হলে তার বণ্টন বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা সবচেয়ে ভাল বোঝা যাবে। ধরুন, একটি খেলনার দোকানে বল বিক্রি করা হয় দুটি করে আর ইট বিক্রি করা হয় তিনটি করে। পাশের খেলনার দোকানে বিক্রি হয় দুটি বল ও তিনটি ইটের মিশ্রিত প্যাক। এক ব্যাগ বল ও এক ব্যাগ ইট মিলে যা হয়, পাশের দোকানটির একটি মিশ্রণ প্যাকও তাই হয়। ব্যাপারটা ঠিক থাকবে যদি এক দোকানের সাত ব্যাগ বল ও সাত ব্যাগ ইট পাশের দোকান থেকে কেনা মিশ্রণ প্যাকের সাতটির সমান হয়। এটাই বণ্টন ধর্ম। গাণিতিকভাবে আমরা বলি, ৭ × ২ + ৭ × ৩ = ৭ × (২+৩)। সবকিছু ঠিক আছে।

এই বৈশিষ্ট্য শূন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে অদ্ভুত ফল মিলবে। আমরা জানি, ০ + ০ = ০। তাহলে একটি সংখ্যাকে ০ দিয়ে গুণ করা আর (০ +০) দিয়ে গুণ করা একই হবে। উদাহরণ দেখা যাক। ২ × ০ = ২ (০ + ০)। কিন্তু বণ্টন ধর্ম বলছে, ২ (০ + ০) আর ২ × ০ + ২ × ০ একই জিনিস। কিন্তু এর অর্থ হবে ২ × ০ = ২ × ০ + ২ × ০। ২ × ০ এর মান যাই হোক, একে এর সাথে যোগ করলে আগের মানই থাকে। একে অনেকটা শূন্যের মতোই মনে হয়। আসলেও এটি তাই। সমীকরণের দুই পাশ থেকে ২ × ০ বিয়োগ করলে আমরা দেখি ০ = ২ × ০। অতএব, আপনি যাই করেন না কেন, একটি সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্যই মিলবে। এই বিরক্তিকর সংখ্যাটা সংখ্যারেখাকে দুমড়ে-মুচড়ে বিন্দু বানিয়ে দেয়। তবে এই বৈশিষ্ট্য বিরক্তিকর হলেও শূন্যের আসল ক্ষমতা টের পাওয়া যায় গুণের বদলে ভাগ দিতে গেলে।

ঠিক যেভাবে গুণ সংখ্যারেখাকে প্রসারিত করে, তেমনি ভাগ করে সঙ্কুচিত। দুই দিয়ে গুণ করলে সংখায়রেখা দুই গুণ প্রসারিত হবে। দুই দিয়ে ভাগ করলে সংখ্যারেখার রবারের ফিতা দুই গুণ শিথিল হবে। গুণের প্রভাব বাতিল হয়ে যাবে। ভাগ করলেই গুণের প্রভাব চলে যায়। সংখ্যারেখায় প্রসারিত হওয়া দাগ চলে আসবে এর আগের জায়গায়।

শূন্য দিয়ে গুণ করলে কি হতে পারে তা আমরা দেখেছি। সংখ্যারেখার বিলুপ্তি ঘটে। শূন্য দিয়ে ভাগ হওয়া উচিত শূন্য দিয়ে গুণের বিপরীত। ধ্বংস হওয়া সংখ্যারেখাকে এর ফিরিয়ে আনা উচিত। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা হয় না।

আগের উদাহরণে আমরা দেখলাম, ২ × ০ এর মান ০। অতএব, আগের অবস্থায় যেতে হলে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে, (২ × ০)কে ০ দিয়ে ভাগ দিলে ২ ফেরত পাওয়া যাবে। একইভাবে (৩ × ০) কে ০ দিয়ে ভাগ দিলে ৩ পাওয়ার কথা। (৪ × ০) কে ০ দিয়ে ভাগ দিলে ৪ পাওয়ার কথা। কিন্তু আমার তো দেখলামই, ২ × ০, ৩ × ০ ও ৪ × ০ এর প্রতিটির মান ০। অতএব, (২ × ০)/০ এর মান ০/০, (৩ × ০)/০ এর মানও ০/০। একই মান (৪ × ০) এরও। কিন্তু হায়! এর মানে দাঁড়ায়, ০/০ হলো ২ এর সমান। শুধু তাই নয়, এটা ৩ এরও সমান। ৪ এরও। এর কোনো অর্থই হয় না।

১/০ এর দিকে একটি ভিন্নভাবে তাকালেও অদ্ভুত জিনিসের দেখা মেলে। গুণ করলে ভাগের প্রভাব দূর হওয়ার কথা। ফলে ১/০ এর মান হওয়ার কথা ১। কিন্তু আমরা তো দেখলামই, যেকোনো কিছুকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্যই পাওয়া যায়। এমন কোনো সংখ্যা নেই, যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে ১ হবে। অন্তত আমরা এখন পর্যন্ত এমন কোনো সংখ্যা দেখিনি।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা হলো, জোর করে শূন্য দিয়ে ভাগ দিতে গেলে যুক্তি ও গণিতের পুরো ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে যাবে। শূন্য দিয়ে একবার, মাত্র একবার, ভাগ দিয়েই আপনি মহাবিশ্বের সবকিছু গাণিতিকভাবে প্রমাণ করতে পারবেন। আপনি প্রমাণ করতে পারবেন ১ + ১ = ৪২। এটা থেকে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন এরশাদ ছিলেন ভিনগ্রহের একজন বাসিন্দা, কাঁজি নজরুল ইসলাম জন্মেছিলেন উজবেকিস্তানে। অথবা আকাশ ফোঁটার নকশায় পরিপূর্ণ। (উইনস্টন চার্চিল যে একটি গাজর ছিল তা দেখতে পরিশিষ্ট ক পড়ুন।)

শূন্য দিয়ে গুণে ধ্বংস হয় সংখ্যারেখা। কিন্তু শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে ধ্বংস হয় পুরো গাণতিক কাঠামো।

এই একটি সরল সংখ্যার অনেক ক্ষমতা। গণিতে সংখ্যাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শূন্যের অদ্ভুত গাণিতিক ও দার্শনিক বৈশিষ্ট্যের কারণে পাশ্চ্যাত্যের মৌলিক দর্শনের সাথে এর মিল হয়নি।

অনুবাদকের নোট

১। ফার্টাইল ক্রিসেন্টঅঞ্চলটি মধ্যপ্রাচ্যের অন্তর্গত ইরাক, সিরিয়া, ইসরায়েল, ফিলিস্তিন, জর্দান, মিশরের নীলনদ এলাকা ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা ও ইরানের পশ্চিমাংশকে একত্রে ফার্টাইল ক্রিসেন্ট বলে। ম্যাপে একে দেখতে অর্ধচন্দ্রের মতো লাগে।

২। জ্যোতিষবিদ্যা হলো গ্রহ-নক্ষত্র দেখে পৃথিবীর ঘটনার পূর্বাভাস বলার প্রচেষ্টার নাম, যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। একে মানুষ অনেক সময় জ্যোতির্বিদ্যার (astronomy) সাথে গুলিয়ে ফেলেন, যা বিজ্ঞানের একটি শাখা।

৩। এগুলো গ্রিক ভাষার বড় হাতের অক্ষর। আমরা সাধারণত ছোট হাতের অক্ষর দেখি। ছোট হাতের ইটা হলো η এবং মিউ হলো μ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শূন্যতা থেকে শুধু শূন্যতাই মেলে

[পাশ্চাত্যে শূন্যের প্রত্যাখ্যান]

শূন্যতা থেকে কোনো কিছুর সৃষ্টি সম্ভব নয়।

লুক্রেশিয়াস, *দে রেরুম নাতুরা*

পাশ্চাত্য দর্শনের একটি মৌলিক ধারণার সাথে শূন্যের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। সেই ধারণাটির মূলে ছিল পিথাগোরাসের সংখ্যার দর্শন। জেনোর১ প্যারাডক্সগুলোর মাধ্যমে ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পুরো গ্রিক সমাজের মূল ধারণাই ছিল: শূন্যতা (void) বলতে কিছু নেই।

গ্রিক সভ্যতার পতনের অনেক দিন পরেও পিথাগোরাস, এরিস্টটল ও টলেমিদের গড়া গ্রিক সমাজ টিকে ছিল। সেই সমাজে শূন্যতা বলতে কিছু ছিল না। ছিল না শূন্য। এ কারণে পাশ্চাত্য প্রায় দুই হাজার বছর পর্যন্ত শূন্যকে মেনে নিতে পারেনি। এর ফল ছিল অনেক খারাপ। শূন্যের অভাবে গণিতের অগ্রগতি থমকে থাকে। বিজ্ঞানে নতুন নতুন চিন্তার দ্বার রুদ্ধ থাকে। এছাড়াও ঘটনাক্রমে পঞ্জিকায় গণ্ডগোল লাগায়। শূন্যকে গ্রহণ করতে হলে পাশ্চাত্যের দার্শিনিকদেরকে তাদের সমাজকে নির্মূল করতে হত।

গ্রিক সংখ্যা-দর্শনের উৎপত্তি

আদিতে ছিল অনুপাত, অনুপাত ছিল ঈশ্বরের সাথে, আর অনুপাতই ছিল ঈশ্বর। ২

- জন ১:১

জ্যামিতি আবিষ্কার করা মিশরীরয়া গণিত নিয়ে খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা করেনি। তাদের কাছে এটা ছিল দিন গণনা ও ভূমির বিভিন্ন অংশের রক্ষণাবেক্ষণের একটি হাতিয়ার। তবে গ্রিকদের চিন্তাধারা ছিল খুব আলাদা। তারা মনে করত, সংখ্যা ও দর্শনকে আলাদা করা সম্ভব নয়। দুটোকেই তারা খুব গুরুত্বের সাথে নিয়েছিল। আসলে সংখ্যা নিয়ে গ্রিকরা বাস্তবিক অর্থেই খুবই উৎসাহী ছিল।

মেটাপনটামের হিপাসাস জাজাজের ডেকে উঠে দাঁড়ালেন। নিলেন মরার প্রস্তুতি। চারপাশ ঘিরে রয়েছে একটি গোপন ভাতৃসঙ্ঘের সদস্যরা। যাদের বিশ্বাস নষ্ট করেছেন তিনি। হিপাসাস এমন একটি গোপন জিনিস প্রকাশ করেছেন যা গ্রিকদের চিন্তার কৌশলের জন্যে প্রাণঘাতী ছিল। ঐ ভাতৃসঙ্ঘ যে দর্শন দাঁড় করাতে চেয়েছিল তাকে ধ্বংস করার মতো একটি গোপনীয় জিনিস ছিল সেটি। সেই গোপন জিনিস প্রকাশের দায়ে মহান পিথাগোরাস নিজে হিপাসাসকে পানিতে ডুবিয়ে মৃত্যদণ্ড দেন। সংখ্যা-দর্শনকে বাঁচাতে ঐ সঙ্ঘ খুনও করত। কিন্তু হিপাসাস যে গোপন জিনিস ফাঁস করেছিলেন, সেটা শূন্যের তুলনায় তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়।

সঙ্ঘের নেতা ছিলেন প্রাচীনকালের প্রগতিবাদী পিথাগোরাস। বেশিরভাগ বর্ণনা অনুসারে তুরস্কের নিকটবর্তী গ্রিক দ্বীপ সামোসে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ সালে তাঁর জন্ম। দ্বীপটা হেরা দেবীর মন্দির ও খুব উন্নত মদের জন্যে বিখ্যাত। প্রাচীন গ্রিকদের মধ্যে যথেষ্ট কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। কিন্তু পিথাগোরাসের ধ্যানধারণাগুলো হার মানায় সে কুসংস্কারকেও। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি ট্রোজান বীর ইউফরবাসের নবজন্মপ্রাপ্ত রূপ। এ কারণে পিথাগোরাস জোরালোভাবে মনে করতেন, মৃত্যুর পরে প্রাণীদেরসহ সকল আত্মা নতুন দেহে স্থানান্তরিত হয়। এ কারণে তিনি ছিলেন কঠোর নিরামিষভোজী। তবে সিম খেতেন না, কারণ এতে পেট ফুলে যায়। দেখতেও লাগে লজ্জাস্থানের মতো।

হয়ত পিথাগোরাস প্রাচীনকালের একজন প্রগতিবাদী চিন্তাবিদ হয়ে থাকবেন। তবে তিনি ছিলেন জাঁদরলে বক্তা। প্রখ্যাত পণ্ডিত। আর একজন জাদুকরী শিক্ষক। কথিত আছে, তিনি ইতালিতে বসবাসরত গ্রিকদের জন্যে সংবিধান রচনা করেছিলেন।ছাত্ররা দলে দলে জড় হত তাঁর কাছে। অল্প দিনের মাথায়ই তিনি একদল উচ্চপদস্থ শিষ্য পেলেন, যারা মনিবের কাছ থেকে শিখতে উৎসুক ছিল।

পিথাগোরীয়রা নেতার অনুশাসন মেনে চলত। তাদের বিশ্বাসের মধ্যে অন্যতম ছিল, মহিলাদের সাথে একান্তে সময় কাটানো উচিত শীতকালে। গ্রীষ্মকালে এটা করা যাবে না। তাদের মতে, খাবার ঠিক মতো হজম না হওয়াই সব রোগের মূল কারণ, খাওয়া উচিত শুধু কাঁচা খাবার, পানি ছাড়া অন্য কিছু পান করা ঠিক নয় এবং মোটেই পশমি কাপড় পরা যাবে না।

গ্রিকরা তাদের সংখ্যাগুলো পায় মিশরীয় জ্যামিতিবিদদের কাছ থেকে। এ কারণে গ্রিক গণিতে আকৃতি ও সংখ্যার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। গ্রিক গণিত ও দার্শকনিকদের কাছে এ দুটো জিনিস ছিল একই। (তাদের প্রভাবের কারণে এমনকি আজও আমরা *বর্গ* সংখ্যা ও *ত্রিভুজ* সংখ্যা দেখতে পাই) [চিত্র ৫] সে সময় গাণিতিক উপপাদ্য প্রমাণ করা ছিল সুন্দর একটি ছবি আঁকার মতোই সোজা। প্রাচীন গ্রিক গণিতবিদরা পেন্সিল ও কাগজের বদলে ব্যবহার করত কম্পাস ও রুলার। আর গ্রিকদের কাছে আকৃতি ও সংখ্যার সম্পর্ক ছিল খুব গভীর ও গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ।প্রতিটি সংখ্যা-আকৃতির ছিল একটি করে গোপন অর্থ। আর সবচেয়ে সুন্দর সংখ্যা-আকৃতিগুলোকে পবিত্র মনে করা হত।

স্বাভাবিকভাবেই পিথাগোরীয়দের আধ্যাত্মিক প্রতীকও ছিল একটি সংখ্যা-আকৃতি: পেন্টাগ্রাম বা পাঁচকোণা তারা। এই ছোট ছবিটিই অসীমের একটি ছোট্ট নমুনা। তারার রেখাগুলোকে জড়িয়ে আছে পঞ্চভুজটি। পঞ্চভুজের কোণাগুলোকে রেখার সাথে যোগ করলে একটি ছোট ও উল্টা পাঁচকোণা তারা পাওয়া যায়। যা অনুপাতের দিক থেকে ঠিক আগের তারাটির মতোই। এতেও আবার আরও ছোট একটি পঞ্চভুজ আছে। যাতে আছে আরও ছোট একটি তারা ও ছোট একটি পঞ্চভুজ। এভাবে চলতেই থাকে (৬ নং চিত্র দেখুন)। তবে মজার ব্যাপার হলো, পিথাগোরীয়দের কাছে পেন্টাগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই স্ব-পুনরাবৃত্তি ছিল না। সেটা লুকানো ছিল তারার রেখার মধ্যে। এগুলোর মধ্যে ছিল একটি সংখ্যা-আকৃতি, পিথাগোরীয়দের কাছে যা ছিল মহাবিশ্বের চূড়ান্ত প্রতীক। সেটা হলো গোল্ডেন রেশিও বা সোনালী অনুপাত।

চিত্র ৫

বর্গ ও ত্রিভুজ সংখ্যা

চিত্র ৬

পেন্টাগ্রাম

সোনালী অনুপাত গুরুত্ব পেয়েছেও একটি পিথাগোরীয় আবিষ্কার থেকে। যদিও এখন সেটা নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না। আধুনিক স্কুলগুলোতে শিশুরা পিথাগোরাসের নাম শোনে তাঁর বিখ্যাত উপপাদ্যটির জন্যেই: সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গ অপর দুই বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান। তবে এটা আসলে আরও প্রাচীন আবিষ্কার। পিথাগোরাসের জন্মের ১,০০০ বছরেরও বেশি সময় আগে এটা মানুষ জানত। প্রাচীন গ্রিসে মানুষ পিথাগোরাসকে চিনত অন্য একটি আবিষ্কারের জন্যে। সেটা হলো সঙ্গীত গ্রাম।

লোককাহিনী অনুসারে একদিন পিথাগোরাস একটি একতারা নিয়ে খেলছিলেন। যা একটি বক্স ও একটি তার দিয়ে তৈরি (চিত্র ৭)। একটি সোয়াড়িকে একতারার উপরে-নীচে নামিয়ে পিথাগোরাস তাঁর যন্ত্রের সুর পরিবর্তন করতেন। একটু পরেই তিনি বুঝতে পারলেন, তারের একটি অদ্ভুত হলেও অনুমেয় আচরণ লক্ষ্যণীয়। সোয়াড়ি ছাড়া তারকে টান দিলে একটি পরিষ্কার সুর পাওয়া যায়। এর নাম মৌলিক সুর। সোয়াড়িকে একতারায় রেখে তারের সাথে স্পর্শ করালে বাজতে থাকে সুর পাল্টে যায়। সোয়াড়িকে একতারার ও তারের ঠিক মাঝখানে রাখলে তারের দুই অংশেই একই সুর বাজে। এই সুর হয় তারের মৌলিক সুরের চেয়ে পুরোপুরি এক অষ্টক বেশি। সোয়াড়িকে একটু সরালে হয়ত এক অংশে তারের তিন পঞ্চমাংশ ও অপর অংশে দুই পঞ্চমাংশ থাকল। পিথাগোরাস দেখলেন, তারের অংশগুলোকে ধরে টান দিলে দুটি নিখুঁত পঞ্চক সুর তৈরি হয়। একেই সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্মৃতি-জাগানিয়া সঙ্গীত মিশ্রণ বলা হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে পাওয়া যায় ভিন্ন সুর। সেটা আনন্দদায়কও হতে পারে, বিরক্তিকরও হতে পারে। (যেমন, বেসুরো ত্রিসুরকে (tritone) বলা হয় সঙ্গীতের প্রেত। মধ্যযুগের সঙ্গীত বিশারদরা এই সুর গ্রহণ করেননি। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, পিথাগোরাস যখন সোয়াড়িকে তারের এমন জায়গায় রাখলেন যেখানে তার সরল অনুপাতে বিভক্ত হয় না, তখন সৃষ্ট সুর ভাল হয় না। উৎপন্ন শব্দ হত বেসুরো। মাঝেমাঝে হত অনেক খারাপ। মাঝেমধ্যে তো সুর পাগলের মতো উঠা-নামা করত।

পিথাগোরাসের কাছে সঙ্গীত ছিল একটি গাণিতিক চর্চা। বর্গ ও ত্রিভুজের মতোই রেখারাও ছিল সংখ্যা-আকৃতি। অতএব, একটি তারকে দুই ভাগ করা আর দুই সংখ্যার একটি অনুপাত নিয়ে কাজ করা একই কথা। একতারার ঐকতান আসলে গণিতেরই ঐকতান। এবং প্রকারান্তরে মহাবিশ্বেরেই ঐকতান। পিথাগোরাস রায় দিলেন, শুধু সঙ্গীতকেই নয়, অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করে সকল সৌন্দর্যকে। পিথাগোরীয়রা মনে করতেন, অনুপাত সঙ্গীত ও ভৌত সৌন্দর্যের এবং গাণিতিক সৌন্দর্যের নিয়ন্তা। প্রকৃতিকে বোঝা ছিল অনুপাতের গাণিতিক বিধি বোঝার মতোই সরল কাজ।

চিত্র ৭

মরমি একতারা

সঙ্গীত, গণিত ও প্রকৃতির পরস্পরপরিবর্তনীয়তার এই দর্শনের ওপর নির্ভর করেই পিথাগোরীয়দের প্রাথমিক গ্রহমডেল তৈরি হয়। পিথাগোরাস বললেন, পৃথিবী আছে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। আর সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্ররা ঘুরছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে। যার প্রতিটি আছে নিজ নিজ গোলকে (চিত্র ৮)। গোলকগুলোর সাইজের অনুপাত ছিল সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। গোলকের চলনের তালে তালে তৈরি হত সঙ্গীত। সবচেয়ে বাইরের গ্রহ বৃহস্পতি ও শনি৩ ঘুরত সবচেয়ে জোরে। ফলে এদের স্বরগ্রামের সুর হয় সবচেয়ে বেশি। চাঁদের মতো সবচেয়ে ভেতরের দিকের বস্তুগুলোর সুর ছিল হালকা। সবমিলিয়ে চলমান গ্রহুগুলো গোলকের মধ্যে একটি ঐকতান তৈরি করেছিল। আর মহাকাশে বাজে সুন্দর সুন্দর সব গাণিতিক গীত। 'সবকিছুই সংখ্যা' বলে পিথাগোরাস এটাই বুঝিয়েছিলেন।

চিত্র ৮: গ্রিক মহাবিশ্ব

প্রকৃতিকে জানার মূল মাধ্যম ছিল অনুপাত। এ কারণে পিথাগোরীয় এবং তাদের পরে গ্রিক গণিতবিদরা অনুপাতের বৈশিষ্ট্য জানার প্রচেষ্টা চালিয়েই বেশিরভাগ সময় পার করেছেন। শেষ পর্যন্ত তারা অনুপাতকে ১০টি আলাদা ভাগে বিভক্ত করেন। এর মধ্যে একটি নাম হোল তরঙ্গ গড়। এমন একটি গড়ই বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর৪ সংখ্যা তৈরি করেছে। এটা হলো সোনালী অনুপাত (Golden ratio)।

মোহনীয় এই গড়টি পেতে হলে একটি রেখাকে বিশেষ উপায়ে বিভক্ত করতে হবে। একে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যাতে ছোট ও বড় অংশের অনুপাত বড় অংশ ও পুরো অংশের অনুপাতের সমান হয় (দেখুন পরিশিষ্ট খ)। এভাবে বললে জিনিসটাকে তেমন কিছু মনে হয় না। কিন্তু এই অনুপাত থেকে পাওয়া ছবিগুলোকে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস মনে হয়। এমনকি আজকের দিনেও স্থপতিরা সহজাতভাবেই জানেন, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এই অনুপাত মেনে বানানো স্থাপনা সবচেয়ে নান্দনিক হয়। এ কারণেই শিল্প ও স্থাপত্যের বহু জায়গায় এই অনুপাতের ব্যবহার দেখা যায়। কিছু কিছু ইতিহাস ও গণিতবিদের মতে পার্থানন নামের রাজকীয় অ্যাথেনীয় মন্দির এমনভাবে বানানো হয়েছিল যাতে এর প্রতিটি দিকেই সোনালী অনুপাত দৃশ্যমান হয়। এমনকি প্রকৃতির সৃষ্টিকৌশলেও দেখা যায় সোনালী অনুপাতের উপস্থিতি। শামুকজাতীয় প্রাণীদের পরপর দুটি প্রকোষ্ঠের আকারের অনুপাত তুলনা করুন। অথবা আনারসের ডানাবর্তী ও বামাবর্তী খাঁজগুলোর অনুপাত দেখুন। দেখা যাবে এই অনুপাত সোনালী অনুপাতের খুব কাছাকাছি।

পেন্টাগ্রাম হয়ে ওঠে পিথাগোরীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘের সবচেয়ে পবিত্র প্রতীক। এর কারণ হলো পেন্টাগ্রামের রেখাগুলোও এই বিশেষ উপায়ে গঠিত। সোনালী অনুপাত দিতে পরিপূর্ণ। আর পিথাগোরাস মনে করতেন সোনালী অনুপাত হলো সব সংখ্যার রাজা। শিল্পী ও প্রকৃতির কাছে সোনালী অনুপাত সমানে ভালবাসা পায়। এ যেন পিথাগোরাসের কথারই প্রতিধ্বনি: সঙ্গীত, সৌন্দর্য, স্থাপত্য ও মহাবিশ্বেরই গঠন একে অপরের সাথে সম্পর্কিত ও অবিচ্ছেদ্য। পিথাগোরীয়দের মতে অনুপাতই মহাবিশ্বের নিয়ন্তা। আর একসময় যা শুধু ভাবত পিথাগোরীয়, অল্পদিনের মাথায়ই তা পুরো পাশ্চাত্য বিশ্বের ভাবনা হয়ে দাঁড়াল। নান্দনিকতা, অনুপাত ও মহাবিশ্বের অতিপ্রাকৃত সম্পর্ক পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি প্রধান ও দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাসে পরিণত হলো। শেক্সপিয়রের সময় পর্যন্তুও বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অনুপাতের কক্ষপথের প্রদক্ষিণ নিয়ে কথা বলতেন। বলতেন স্বর্গীয় গীতের কথা। যার সুর প্রবাহিত হত পুরো মহাবিশ্বে।

চিত্র ৯: পার্থানন, শামুকের খোলস ও সোনালী অনুপাত

পিথাগোরীয় সংস্কৃতিতে শূন্যের কোনো স্থান ছিল না। সংখ্যা ও আকৃতির সমতুল্যতা প্রাচীন গ্রিকদেরকে জ্যামিতির নায়ক বানিয়েছিল। কিন্তু এতে ছিল বড় একটি অসুবিধে। এ ধারণার কারণে শূন্যকে সংখ্যা বিবেচনার কথাটি কারও মাথায় আসেনি। শূন্যের আবার কিসের আকৃতি থাকবে?

দুই একক দৈর্ঘ্য ও দুই একক প্রস্থের একটি বর্গ কল্পনা করা খুব সহজ। কিন্তু শূন্য দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটি বর্গ কেমন হবে? দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নেই, নেই কোনো উপাদানও- এমন কিছুকে বর্গ হিসেবে কল্পনা করা কঠিন একটি কাজ। ফলে শূন্য দিয়ে গুণ করাও ছিল অর্থহীন কাজ। দুটি সংখ্যাকে গুণ করা মানেই একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাওয়া। কিন্তু শূন্য দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটি আয়তের ক্ষেত্রফল কত হতে পারে?

বর্তমানে গণিতের বড় বড় অমীমাংসিত সমস্যাগুলোকে উপস্থাপন করা হয় গণিতবিদদের পক্ষে সমাধানের অযোগ্য অনুমান (conjecture) আকারে। তবে প্রাচীন গ্রিসে সংখ্যা-আকৃতিগুলো ভিন্ন একটি চিন্তার উপায় খুলে দিয়েছিল। সে সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত অমীমাংসিত সমস্যাটি ছিল জ্যামিতির। শুধু কম্পাস ও রুলার দিয়ে আপনি কি এমন একটি বর্গ আঁকতে পারবেন, যার ক্ষেত্রফল একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান? এই যন্ত্রগুলো দিয়ে আপনি কি একটি কোণকে তিন ভাগ করতে পারবেন? জ্যামিতিক গঠন ও আকৃতি ছিল একই জিনিস। শূন্য ছিল এমন একটি সংখ্যা যার কোনো রকম জ্যামিতিক অর্থ থাকতে পারে বলে মনে করা হত না। তার মানে শূন্যকে ঠাঁই দিতে হলে গ্রিকদেরকে পুরো গাণিতিক কাজের পদ্ধতিই পাল্টে ফেলতে হত। তারা সেটা না করল না।

গ্রিক পদ্ধতিতে শূন্য যদি থেকেও থাকত, তবুও শূন্যকে দিয়ে অনুপাত বানানোকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ মনে হত। দুটি বস্তুর সম্পর্ককে কে আর অনুপাত আকারে প্রকাশ করা যেত না। শূন্য ও অন্য যে কোনো সংখ্যার অনুপাত, মানে শূন্যকে যে কোনো সংখ্যাকে দিয়ে ভাগ দিলে প্রাপ্ত সংখ্যা হবে শূন্যই। অন্য সংখ্যাটিকে শূন্য একেবারেই গিলে ফেলে। আর এদিকে কোনোকিছু ও শূন্যের অনুপাত, মানে কোনো একটি সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যুক্তিই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। পরিচ্ছন্ন পিথাগোরীয় মহাবিশ্বে শূন্য একটুখানি ময়লা জমিয়ে দেয়। এ কারণেই শূন্যকে বরদাস্ত করা সম্ভব হয়নি।

আসলে গ্রিকরা আরেকটি অসুবিধাজনক গাণিতিক ধারণাকেও ঘৃণা করে এসেছিল। মূলদ সংখ্যা। পিথাগোরীয় চিন্তায় প্রথম বাধা ছিল এটিই। তারা এটাকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। আর এই জিনিসটা প্রকাশ্যে চলে এলে তারা সহিংস হয়ে উঠল।

অমূলদ সংখ্যার ধারণা গ্রিক গণিতের মধ্যে লুকিয়ে ছিল টাইম বোমার মতো। সংখ্যা ও আকৃতির দ্বৈততার কারণে গ্রিকদের কাছে গণনা আর রেখার দৈর্ঘ্য মাপা ছিল একই কাজ। এ কারণে দুটি সংখ্যার অনুপাত বের করতে ভিন্ন দৈর্ঘ্যের দুটি রেখাকে তুলনা করাই যথেষ্ট ছিল। তবে যেকোনো ধরনের পরিমাপ করতে গেলেই একটি আদর্শ দরকার হয়। এমন একটি মাপকাঠি, যেটা দিয়ে দুটি রেখার সাইজ তুলনা করা যাবে। উদাহরণ হিসেবে ধরুন, একটি রেখার দৈর্ঘ্য বরাবর এক ফুট। এর এক প্রান্ত থেকে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি দূরে একটি দাগ দিলেন। এর ফলে আগের এক ফুট এখন দুটি অসমান খণ্ডে বিভক্ত হলো। গ্রিকরা এই অনুপাত বের করার জন্যে রেখাটিকে খণ্ডে ভাগ করত। অর্ধ-ইঞ্চি বা এমন কিছুকে ব্যবহার করত আদর্শ বা মাপকাঠি হিসেবে। ফলে এক অংশে থাকবে ১১টি দাগ, আর আরেক অংশে ১৩টি।৫ অতএব, দুই অংশের অনুপাত হবে ১১:১৩।

পিথাগোরাসের প্রত্যাশা অনুসারে মহাবিশ্বের সবকিছুকে অনুপাত মেনে চলতে হলে মহাবিশ্বের অর্থবহ সবকিছুকে সুন্দর ও সরল অনুপাতের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। তাকে হতে হবে মূলদবা যৌক্তিকসংখ্যা (rational number)৬। আরও স্পষ্ট করে বললে, এই অনুপাতগুলোকে a/b আকারে লিখতে হত। যেখানে a ও b হবে ১, ২ বা ৪৭-এর মতো দেখতে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন গণনা (স্বাভাবিক৭) সংখ্যা। (গণিতবিদরা খুব সাবধান! এ জন্যে বলেই রাখেন, b এর মান শূন্য হওয়া সম্ভব নয়। কারণ সেক্ষেত্রে ভাগ দিতে হবে শূন্য দিয়ে, যা এক ভয়ানক কাজ।) বলাই বাহুল্য, মহাবিশ্ব এতটা সাজানো-গোছানো নয়। কিছু কিছু সংখ্যাকে a/b ধরনের সরল ভগাংশ আকারে লেখা সম্ভব হয় না। এই অমূলদ সংখ্যাগুলো ছিল গ্রিক গণিতের অনিবার্য ফল।

বর্গ জ্যামিতির অন্যতম সরল একটি চিত্র। পিথাগোরীয়রা একে যথাযথ সম্মানও দিত। (চারটি মৌলিক উপাদানের আদলে এর ছিল চারটি বাহু। এটা ছিল নিখুঁত সংখ্যার প্রতীক।) কিন্তু বর্গের সারল্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মূলদ সংখ্যা। বর্গের বিপরীত কোণাকে যুক্ত করে কর্ণ আঁকলেই চলে আসে অমূলদ সংখ্যা। মনে করুন, একটি বর্গের সবগুলো বাহুর দৈর্ঘ্য ১ ফুট করে। মনে মনে (বা বাস্তবেই) এটা এঁকে ফেলুন। গ্রিকদের মতো অনুপাতে নিমগ্ন থাকা মানুষ বর্গের বাহু ও কর্ণের দিকে জিজ্ঞেস করবে: এই দুটি রেখার অনুপাত কত?

আগের মতোই প্রথম কাজ হলো একটি আদর্শ মাপকাঠি তৈরি করা। সেটা হতে পারে অর্ধ-ইঞ্চির একটি ছোট্ট রুলার। এবার কাজ হলো সেই মাপকাঠি দিয়ে প্রতিটি বাহুকে সমান সমান ভাগে বিভক্ত করা। অর্ধ-ইঞ্চির মাপকাঠি দিয়ে আমরা এক ফুটের (১২ ইঞ্চি) বাহুকে ২৪ খণ্ড করতে পারব, যার প্রতিটি অর্ধ-ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু কর্ণকে মাপলে কী হবে? একই মাপকাঠি দিয়ে কর্ণের দৈর্ঘ্যকে মাপলে ৩৪টির মতো খণ্ড পাওয়া যাবে। কিন্তু পুরোপুরি মিলবে না। ৩৪তম খণ্ডটি হবে সামান্য ছোট। অর্ধ-ইঞ্চির রুলার বর্গের কোণা দিয়ে একটুখানি বেরিয়ে থাকবে। আমরা আরও ভালোভাবেও মাপতে পারব। রেখাটিকে আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করলেই হবে। ধরুন, আমরা ব্যবহার করলাম এক ইঞ্চির ৬ ভাগের এক ভাগ সমান একটি রুলার। এবার বর্গের বাহু ৭২ খণ্ডে বিভক্ত হবে। আর কর্ণে খণ্ড পাওয়া যাবে ১০১টির বেশি। তবে ১০২টির কম। এবারেও পরিমাপ নিখুঁত হবে না। আরও অনেক ছোট মাপকাঠি নিলে কী হবে? এক ইঞ্চির দশ কোটি ভাগের ভাগ সমান দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি নিলে? বর্গের বাহু হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ খণ্ড। আর কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে ১৬,৯৭,০৫,৬৩ খণ্ডের চেয়ে একটু কম। এই রুলার দিয়েও রেখা দুইটির মধ্যে সমন্বয় করা যাচ্ছে না। আসল কথা হলো, কোনো রুলার দিয়েই সঠিক পরিমাপ পাওয়া যাবে না।

আসলে আপনি রুলার যত ছোটই করেন না কেন, বর্গের বাহু ও কর্ণ উভয়কে নিখুঁতভাবে মাপার মতো একটি মাপকাঠি কখনোই পাওয়া যাবে না। কর্ণ ও বাহু একই সাথে অনির্ণেয়। কিন্তু একই মাপকাঠি না হলে দুটি রেখাকে অনুপাত আকারে প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। একক সাইজের একটি বর্গের জন্যে এর অর্থ দাঁড়ায়, আমরা একম কোনো গণন সংখ্যা a ও b পাব না যারা বর্গের যথাক্রমে বর্গের বাহু ও কর্ণ হবে এবং যাদেরকে a/b আকারে প্রকাশ করা যাবে। অন্য কথায়, এই বর্গের কর্ণ একটি অমূলদ সংখ্যা। আমরা আজকাল একে দুইয়ের বর্গমূল হিসেবে চিনি।

এটা পিথাগোরীয় গণিতের জন্যে অশনি সঙ্কেত। প্রকৃতি কীভাবে অনুপাত দিয়ে পরিচালিত হবে, যেখানে বর্গের মতো একটি সরল জিনিস অনুপাতের ভাষাকে গোলমেলে কোরে ফেল? এই জিনিসটি বিশ্বাস করা পিথাগোরীয়দের জন্যে ছিল কঠিন। কিন্তু একে অস্বীকার করার যে জো নেই। এটা তাদের প্রিয় গাণিতিক বিধিরই একটি ফল। গণিতের ইতিহাসের অন্যতম প্রথম একটি প্রমাণই হলো বর্গের কর্ণের অপরিমাপযোগ্যতা বা অমূলদতা।

পিথাগোরাসের কাছে অমূলদ সংখ্যারা ছিল ভয়াবহ। কারণ, অনুপাত-মহাবিশ্ব পড়ে গিয়েছিল হুমকির মুখে। কফিনে আরেকটি পেরেক যুক্ত হয় যখ পিথাগোরাস দেখলেন সোনালী অনুপাতও অমূলদ সংখ্যা। অথচ এই সংখ্যাটিই পিথাগোরীয়দের কাছে সৌন্দর্য ও যুক্তির চূড়ান্ত প্রতীক ছিল। এই ভয়ানক সংখ্যাগুলো যাতে পিথাগোরীয় মতবাদের ক্ষতি না পারে সেজন্যে এদেরকে গোপন রাখা হলো। পিথাগোরীয় সঙ্ঘের সবাইকে এমনিতেই কম কথা বলতে হত। এমনকি লিখিত নোট রাখার অনুমতিও ছিল না কারও। দুইয়ের বর্গমূলের অপরিমাপযোগ্যতা হয়ে উঠল সবচেয়ে বড় ও কলুষিত গোপনীয় বিষয়।

তবে গ্রিকরা অমূলদ সংখ্যাকে শূন্যের মতো এত সহজে অবহেলা করে থাকতে পারেনি। সব ধরনের জ্যামিতিক চিত্রে ঘুরেফিরে এদের দেখা পাওয়া যাচ্ছিল। জ্যামিতি ও অনুপাত নিয়ে এতটা নিমগ্ন থাকা একটা জাতির কাছ থেকে অমূলদ সংখ্যাকে খুব বেশি দিন লুকিয়ে রাখা কঠিন। একদিন না একদিন কেউ একজন ব্যাপারটা ফাঁস করে ফেলতই। এই কেউ একজন ছিলেন মেটাপন্টাম এলাকার হিপাসাস। তিনিও ছিলেন পিথাগোরীয় সঙ্ঘের একজন গণিতবিদ। অমূলদ সংখ্যার রহস্য ফাঁস করে তাকে মারাত্মক বিপাকে পড়তে হয়েছিল।

হিপাসাসের বিশ্বাসঘাতকতা ও চূড়ান্ত পরিণতি নিয়ে প্রচলিত গল্পগুলো খুব অস্পষ্ট ও পরস্পরবিরোধী। গণিতবিদরা আজও অমূলদ সংখ্যার রহস্যা ফাঁস করা দূর্ভাগা এই গণিতবিদের কথা বলেন। কেউ কেউ বলেন পিথাগোরাস তাকে জাহাজ থেকে ফেলে দিয়ে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তাঁর মতে, নান্দনিক এক গাণিতিক তত্ত্বকে অসুন্দর তথ্য দিয়ে ধ্বংস করার উচিত শাস্তি এটাই। প্রাচীন সূত্র থেকে জানা যায়, পাপের শাস্তি হিসেবে সমুদ্রে ডুবে মরেছিলেন হিপাসাস। কেউ কেউ আবার বলছেন, তাকে সমাজচ্যুত করা হয় এবং তার জন্যে একটি কবর নির্মাণ করা হয়। এভাবে তাকে সমাজ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। তবে হিপাসাসের সত্যিকার পরিণতি যাই হোক না কেন, এটা সত্যি যে তার সঙ্গীরা তাকে তিরস্কার করেছিল। তিনি যা ফাঁস করলেন সেটা পিথাগোরীয় মতবাদের ভিতকেই কাঁপিয়ে দেয়। কিন্তু অমূলদ সংখ্যাকে একটি ব্যতিক্রম বলে চালিয়ে দিয়েই পিথাগোরীয়রা মহাবিশ্ব সম্পর্কে নিজেদের ভাবনাকে কলুষিত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারত। এবং সত্যি বলতে সময়ের সাথে সাথে গ্রিকরা অমূলদ সংখ্যাকে নিজেদের সংখ্যার অংশ বানিয়ে নিতে নিমরাজি হয়। পিথাগোরাসকে অমূলদ সংখ্যারা মারেনি। মেরেছে শিম।

হিপাসাসের মতোই পিথাগোরাসের মৃত্যুর বর্ণনাও অস্পষ্ট। তবে সবগুলোই বলছে, মৃত্যুটা হয়েছিল অস্বাভাবিক উপায়ে। কেউ কেউ বলেন, পিথাগোরাস উপবাস থেকে থেকে মারা গিয়েছেন। তবে গল্পের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সংস্করণ অনুসারে তার মৃত্যুর কারণ ছিল শিম। গল্পের একটি সংস্করণ অনুসারে, একদিন শত্রুরা (যাদেরক পিথাগোরাসের সামনে আসতে দেওয়ার যোগ্য মনে না করায় তারা রেগে ছিল) তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আর সঙ্ঘের লোকেরা প্রাণভয়ে এদিক-সেদিক ছুটে যায়। উত্তেজিত জনতা পিথাগোরীয়দের একের পর এক জবাই করতে থাকে। ভ্রাতৃসঙ্ঘ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। পিথাগোরাস নিজেও জীবন বাঁচাতে পালাতে লাগলেন। পালিয়ে যেতে পারতেন। যদি না আটকে পড়তেন শিমক্ষেতে। সেখানেই থেমে গেলেন তিনি। ঘোষণা দিলেন, মারা গেলে যাবেন, কিন্তু শিমক্ষেতে পারই দেবেন না। পেছন পেছন আসা মানুষগুলো তো খুব খুশি। তারা দিল গলা কেটে।

সঙ্ঘ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। নেতা মারা গেলেন। কিন্তু পিথাগোরাসের মূল শিক্ষা বেঁচে রইল। অল্প দিনের মধ্যেই সেটি পাশ্চাত্য ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী দর্শনে পরিণত হলো। সেই দর্শনের নাম এরিস্টটলীয় মতবাদ। যা টিকে থেকেছিল পরের দুই হাজার বছর। শূন্যের সাথে এই মতবাদের সংঘর্ষ হয়। তবে অমূলদ সংখ্যাকে উপেক্ষা করা না গেলেও শূন্যকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল। গ্রিক সংখ্যাপদ্ধতির সংখ্যা ও আকৃতির দ্বৈতরূপ কাজটিকে সহজ করে দেয়। কারণ শূন্যের তো আর কোনো আকৃতি ছিল না। ফলে এর পক্ষে সংখ্যা হওয়াও সম্ভব ছিল না।

তবুও শূন্যের স্বীকৃতি কিন্তু গ্রিক সংখ্যাপদ্ধতি ঠেকিয়ে রাখেনি। রাতের আকাশ নিয়ে মগ্ন থাকার কারণে গ্রিকরা শূন্য নিয়ে জানতে পেরেছিল। বেশিরভাগ প্রাচীন মানুষের মতোই গ্রিকরা রাতের আকাশ দেখত। আর রাতের আকাশে সবার আগে হাত পাকিয়েছিল ব্যাবিলনীয়রা। তারা সূর্য ও চন্দ্রগহণের পূর্বাভাস দেওয়ার উপায় জানত। প্রথম গ্রিক জ্যোতির্বিদ থ্যালিস এটা শিখেছিলেন ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে। কিংবা হয়ত মিশরীয়দের মাধ্যমে শিখে থাকবেন। বলা হয়ে থাকে, খৃষ্টপূর্ব ৫৮৫ সালে তিনি একটি সূর্যগ্রহণের পূর্বাভাস প্রদান করেছিলেন।

ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সাথে এসেছিল ব্যাবিলনীয় সংখ্যাও। জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজনে গ্রিকরা ষাটভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। ঘণ্টাকে ভাগ করেছিল ৬০ মিনিটে। আর মিনিটকে ৬০ ভাগে। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ সালের দিকে ব্যাবিলনীয় লেখালেখিতে শূন্যের আবির্ভাব ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই গ্রিক জ্যোতির্বিদরাও এর ব্যবহার শুরু করে দেন। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যার স্বর্ণযুগে গ্রিক জ্যোতির্বিদ্যার টেবিলগুলোতে শূন্যের ব্যবহার ছিল খুব সাধারণ ঘটনা। এর প্রতীক ছিল ছোট হাতের ওমাইক্রোন oর মতো। যা দেখতে অনেকটাই আধুনিক যুগের শূন্যের মতোই। যদিও এটা হয়ত নিছকই কাকতালীয় ঘটনা। (সম্ভবত ওমাইক্রোনের ব্যবহার শুরু হয়েছে 'কিছু না' এর গ্রিক প্রতিশব্দ ouden এর প্রথম অক্ষর থেকে। গ্রিকরা শূন্যকে মোটেই পছন্দ করত না। ব্যবহার করত যতটা সম্ভব কম। ব্যাবিলনীয় প্রতীক দিয়ে হিসাব-নিকাশ করের পরে গ্রিক জ্যোতির্বিদরা সাধারণত সংখ্যাগুলোকে আবারও গুরুগম্ভীর গ্রিক সংখ্যায় রূপান্তর করে নিত। যেখানে শূন্য থাকত অনুপস্থিত। প্রাচীন পাশ্চাত্য সংখ্যাপদ্ধতিতে শূন্য কখনোই স্থান পায়নি। এ কারণে ওমাইক্রোন শূন্যের (0) আদিরূপ হবে তার সম্ভাবনা কম। হিসাব করতে গিয়ে গ্রিকরা শূন্যের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল। তবুও প্রত্যাখ্যান করতে বাঁধেনি।

তার মানে গ্রিকরা কিন্তু অজ্ঞতার কারণে শূন্যকে প্রত্যাখ্যান করেনি। করেনি সংখ্যা-আকৃতির সীমাবদ্ধতার কারণেও। এটা ছিল তাদের দর্শনের ফল। পাশ্চাত্যের মৌলিক দার্শনিক বিশ্বাসের সাথে শূন্যের সঙ্ঘাত হয়। কারণ শূন্যের মধ্যে এমন দুটি ধারণা আছে যা পাশ্চাত্য মতবাদের জন্যে হুমকি। এবং এই ধারণাগুলোই এরিস্টটলীয় দর্শনের দীর্ঘ সময় ধরে চলা প্রভাবকে শেষ করে দেয়। এই ভয়ানক ধারণাগুলো হলো শূন্যতা ও অসীম।

অসীম, শূন্যতা ও পাশ্চাত্য

প্রকৃতিবিদরা মাছি পর্যবেক্ষণ করেন

আছে এর চেয়ে ছোট মাছি যা তাকে শিকার করে

তার চেয়েও ছোট মাছিও আছে যা তাকে কামড় দেয়।

এভাবেই চলে অসীম পর্যন্ত...

-জোনাথন সুইফট, *অন পয়েট্রি অ্যান্ড রাফসডি*

অসীম ও শূন্যতার শক্তি নিয়ে গ্রিকরা ছিল আতঙ্কিত। সব ধরনের গতিকে অসম্ভব করে তুলছিল অসীম। অন্য দিকে শূন্যতা হুমকি দিচ্ছিল গুচ্ছবদ্ধ মহাবিশ্বকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলার। শূন্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে গ্রিক তাদের মহাবিশ্বকে দুই হাজার বছর টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

পিথাগোরাসের মতবাদ পাশ্চাত্য দর্শনের কেন্দ্রীয় বস্তু হয়ে ওঠে। মহাবিশ্বের সবগুলো তত্ত্বে ছিল অনুপাত ও আকৃতির ছড়াছড়ি। গ্রহরা চলত আকাশের গোলকে। চলতে চলতে তৈরি করত সঙ্গীত। কিন্তু এই গোলকগুলোর বাইরে কী আছে? আরও আরও গোলক? প্রতিটা আগের চেয়ে বড় বড়? নাকি শেষ গোলকেই মহাবিশ্বের সমাপ্তি? এরিস্টটল ও অন্যান্য দার্শনিকরা জোর দিয়ে বলতেন, একের পর এক অসীমসংখ্যক গোলক থাকা সম্ভব নয়। এই দর্শন মেনে নিয়ে পাশ্চাত্য বিশ্ব অসীমকে মাথা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিল। তারা একে একাবারেই অস্বীকার করত। ওদিকে ইলিয়া শহরের জেনোর কল্যাণে অসীম পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলতে শুরু করে দিয়েছিল। জেনোর সমসাময়িক মানুষরা তাকে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে বিরক্তির মানুষ বলে মনে করত।

জেনোর জন্ম খৃষ্টপূর্ব ৪৯০ সালের দিকে। একই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংঘটিত প্রচণ্ড সেই পারসিক যুদ্ধগুলোর সূচনা ঘটেছিল। গ্রিস পারস্যকে পরাজিত করে। গ্রিক দর্শন জেনোকে কখনোই সেভাবে পরাজিত করতে পারেনি। কারণ জেনোর কাছে ছিল একটি প্যারাডক্স। একটি যুক্তিভিত্তিক ধাঁধা যা গ্রিক দার্শিনিকরা যুক্তি দিয়ে বুঝতে অক্ষম ছিলেন। এটাই ছিল গ্রিসের সবচেয়ে বড় যন্ত্রণাদায়ক তর্ক: জেনো অসম্ভবকে প্রমাণ করেছেন।

জেনোর মতে, মহাবিশ্বের কোনও কিছুই চলাচল করতে পারে না। অব্শ্যই এটি একটি ছেলেমানুষি কথা। একটুখানি হেঁটে যে কেউই একে ভুল প্রমাণ করে দিতে পারেন। সবাই জানত জেনোর কথা ভুল। কিন্তু যুক্তির ভুলটা কেউই দেখাতে পারেনি। তিনি একটি প্যারাডক্স নিয়ে আসেন। জেনোর যুক্তির ধাঁধাঁগুলো গ্রিক দার্শনিকদের বিমূঢ় করে দেয়। বাদ যায় পরবর্তী যুগের দার্শনিকরাও। প্রায় দুই হাজার বছর পর্যন্ত জেনোর ধাঁধাঁগুলো গণিতবিদদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলছিল।

সবচেয়ে বিখ্যাত ধাঁধাঁটার কথা বলা যাক। এটায় তি নি দেখান, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলা একটি কচ্ছপ গতিমান একিলিসের চেয়ে একটু আগে চলা শুরু করলে একিলিস কখনোই আর তাকে পেছনে ফেলতে পারেন না। আরও ভাল করে বুঝতে কিছু সংখ্যা ব্যবহার করি। ধরুন, একিলিস সেকেন্ডে এক ফুট চলছেন। আর কচ্ছপ যাচ্ছে তার অর্ধেক গতিতে। আরও ধরুন, কচ্ছপ একিলিসের এক ফুট সামনে থেকে চলা শুরু করল।

একিলিস তীব্র বেগে এগিয়ে গেলেন। এক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি পৌঁছে গেলেন যেখানে একটু আগে কচ্ছপটি ছিল। তবে কচ্ছপটিও তো চলছে। ফলে একিলিস কপচ্ছপের আগের অবস্থানে যেতে যেতে কচ্ছপ আরও এক অর্ধফুট সামনে চলে গেছে। তাতে কী? একিলিস তো আরও দ্রুত চলেন। তাই এই অর্ধফুট দূরত্ব সে অর্ধসেকেন্ডেই পার হয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে কচ্ছপ আরও সামনে চলে গেছে। এবার গেছে সিকি ফুট। সিকি সেকন্ডেই একিলিস সেটাও পার হলো। কিন্তু কচ্ছপ ততক্ষণে আবারও সামনে চলে গেছে। এবার এক ফুটের আট ভাগের এক ভাগ। একিলিস দৌড়েই চলছেন। কিন্তু কচ্ছপ থাকছে সামনেই। একিলিস কচ্ছপের যতই কাছে যান, কচ্ছপ ততই আগের জায়গায় থেকে আরও সামনে চলে যায়। এক ফুটের আট ভাগের এক ভাগ, তারপর ষোল ভাগের এক ভাগ, ... ক্রমশ ছোট ছোট দূরত্ব। একিলিস কাছাকাছি হচ্ছেন, কিন্তু কচ্ছপকে ধরতে পারছেন না। সামনে সবসময় কচ্ছপই।

সবাই জানেন, বাস্তবে একিলিস কচ্ছপকে পার হয়ে যাবেন নিমিষেই। কিন্তু জেনোর যুক্তি থেকে মনে হয় সেটা হবে না কখনও। সে যুগের দার্শনিকরা সে যুক্তিকে ভুল প্রমাণ করতে পারেননি। জানতেন জেনোর যুক্তির ফল ভুল। কিন্তু প্রমাণের গাণিতিক ভুলটাকে ধরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি (চিত্র ১০)।

সমস্যাটি গ্রিকদের কুপোকাত করে দেয়। তবে সমস্যাটির মূল উৎস কিন্তু তারা খুঁজেই পায়নি। সেটা হলো অসীম। জেনোর প্যারাডক্সের ভেতর লুকিয়ে আছে অসীম। জেনো চলমান গতিকে অসীমসংখ্যক বার ভাগ করেছেন। এখানে অসীমসংখ্যক পদক্ষেপ দরকার জেনে গ্রিকরা ধরে নিয়েছিল রেস চিরকাল ধরে চলতে থাকবে। যদিও প্রতি পদক্ষেপে ধাপগুলো ছোট হচ্ছে। তারা মনে করেছিল, রেস কখনোই শেষ হবে না। আসলে অসীম নিয়ে কাজ করার গাণিতিক হাতিয়ার প্রাচীন মানুষের কাছে ছিল না। কিন্তু আধুনিক গণতিবিদরা সে উপায়টা বের করেছেন। অসীম নিয়ে কাজ করতে হয় খুব সাবধানে। তবে একে বশে আনা যায়। লাগবে শূন্যের সাহায্য। ২,৪০০ বছরের গাণিতিক চর্চার কাঁধে ভর করে জেনোর একিলিস ধাঁধাঁয় ফিরে যাওয়া এখন আর কঠিন নয়।

গ্রিকদের কাছে শূন্য ছিল। কিন্তু আমাদের কাছে আছে। আর জেনোর ধাঁধাঁ সমাধানের শূন্যই মূল হাতিয়ার। অনেক সময় অসীমসংখ্যক পদ যোগ করেও সসীম একটি ফল পাওয়া যায়। তবে সেটা হতে হলে পদগুকে ক্রমেই শূন্যের কাছাকাছি যেতে হবে। একিলিস ও কচ্ছপের ক্ষেত্রে এটাই হয়েছে। একিলিসের চলার পথগুলো যোগ করতে শুরু করতে হয় ১ দিয়ে। তারপর যোগ হবে ১/২, তারপর ১/৪, তারপর ১/৮,... এভাবেই চলবে। পদগুলো ক্রমেই ছোট হবে। আর কাছাকাছি হবে শূন্যের। প্রতিটি পদ যেন কোন ভ্রমণের অংশ। যার গন্তব্য শূন্য। কিন্তু গ্রিকরা শূন্যকে বর্জন করেছিল বলে বুঝতে পারেনি এই ভ্রমণের শেষ কোথায়। তাদের কাছে মনে হয়নি, ১/২, ১/৪, ১/৮,... সংখ্যাগুলো কোনও একটি সংখ্যার নিকটবর্তী হচ্ছে। কোনও গন্তব্য নেই। তারা শুধুই দেখেছে, পদগুলো ক্রমশ ছোট হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে সংখ্যার জগৎ থেকে দূরে কোথাও।

আধুনিক গণিতবিদরা জানেন, পদগুলোর একটি সীমা (limit) আছে। ১, ১/২, ১/৪, ১/৮, ১/১৬, … সংখ্যাগুলোর সীমা হলো শূন্য, যার দিকে এরা এগিয়ে যাচ্ছে। এই এগিয়ে চলার একটা গন্তব্য আছে। কোনও ভ্রমণের গন্তব্য থেকে থাকলে জিজ্ঞেস করা যেতেই পারে, গন্তব্যটা কত দূরে আছে। আর সেখানে পৌঁছতে কত সময় লাগবে। একিলিসের চলার পথের দূরত্বগুলো যোগ করা কঠিন নয়। ১+১/২+১/৪+১/৮+১/১৬+...। একইভাবে একিলিসের প্রতিটি পদক্ষেপ ক্রমেই ছোট থেকে আরও ছোট হচ্ছে। হচ্ছে ক্রমেই শূন্যের আরও কাছাকাছি। পদক্ষেপগুলোর যোগফল ক্রমেই ২ এর কাছাকাছি হচ্ছে। এটা আমরা কীভাবে জানলাম? আচ্ছা, ২ থেকে শুরু করে দেখুন। এবার যোগফলে একে একে পদগুলোকে বিয়োগ দিতে থাকুন। প্রথমে বিয়োগ হবে ১। তারপরে ১/২। বাকি থাকবে বাকি ১/২। এবার বিয়োগ করুন ১/৪। তাহলে আর বাকি থাকবে ১/৪। এখান থেকে ১/৮ বিয়োগ করলে থাকবে ১/৮। আমারা আমাদের চেনা ধারায় ফিরে যাচ্ছি। আমরা জানিই, ১, ১/২, ১/৪, ১/৮, ... ধারার সীমা হলো শূন্য (০)। অতএব, পদগুলোকে ২ থেকে বিয়োগ করতে থাকলে কিছুই আর বাকি থাকবে না। ১ + ১/২ + ১/৪ + ১/৮ + ১/১৬ + ... ধারার যোগফলের সীমা হলো ২ (চিত্র ১১)। কচ্ছপকে ধরতে একিলিসকে ২ ফুট যেতে হবে। যদিও এর মধ্যেই তাকে অসীম সংখ্যক পদক্ষেপ ফেলতে হবে। এছাড়াও সময়ের দিকেই দেখুন না। কচ্ছপকে পার হতে একিলিসের কতটুকু সময় লাগবে দেখুন: ১ + ১/২ + ১/৪ + ১/৮ + ১/১৬ + ...। মানে ২ সেকেন্ড। একটি সসীম দূরত্ব পার হতে একিলিস একই সাথে অসীমসংখ্যক পদক্ষেপ ফেলেন, আবার সেই দূরত্ব পার হন মাত্র ২ সেকেন্ডেই।

চিত্র ১১: ১ + ১/২ + ১/৪ + ১/৮ + ১/১৬ + ... = ২

দারুণ এই গাণিতিক বুদ্ধিটা গ্রিকদের মাথায় আসেনি। সীমার ধারণা তাদের জানা ছিল না। কারণ তারা শূন্যকে বিশ্বাস করেনি। তারা মনে করত, অসীম ধারার কোনো সীমা বা গন্তব্য থাকতে পারে না। এমন ধারার পদগুলো শুধুই ছোট হতে থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার দিকে যায় না। এ জন্যেই গ্রিকরা অসীম নিয়ে কাজ করতে পারত না। তারা শূন্যত নিয়ে ভাবত, কিন্তু শূন্যকে সংখ্যা হিসেবে মেনে নেয়নি। ওদিকে তারা অসীম নিয়েও খেলা করেছে। কিন্তু অসীমকে বা যেসব জিনিস অসীম পরিমাণ ছোট বা বড় তাদেরকে সংখ্যার জগতে আসতে দেয়নি। গ্রিক গণিতের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা এটাই। এ কারণেই তারা ক্যালকুলাস আবিষ্কার করতে পারেনি।

অসীম, শূন্য ও সীমার ধারণা একে অপরের সাথে একটি গুচ্ছে মিশে আছে। গ্রিক দার্শনিকরা সেই গুচ্ছের গিঁট খুলতে পারেনি। এ কারণে জেনোর ধাঁধাঁ সমাধানের জন্যে ভাল কোনো উপকরণ তাদের হাতে ছিল না। কিন্তু জেনোর প্যারাডক্সের জোর ছিল অনেক বেশি। গ্রিকরা বারবার চেষ্টা করেছে সেখান থেকে অসীমকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার। কিন্তু সঠিক ধারণার অভাবে ব্যর্থতাই লেখা ছিল তাদের কপালে।

জেনোর নিজের কাছেও সমস্যাটির ভাল কোনো সমাধান ছিল না। তিনি সমাধান খোঁজেনওনি। তার দর্শনের জন্যে প্যারাডক্সটি খুব মানানসই। তিনি ছিলেন ইলীয় ভাবধারার চিন্তাবিদ। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা পার্মানিডিজ মনে করতেন, মহাবিশ্ব মৌলিকভাবে পরিবর্তনহীন ও নিশ্চল। দেখা গেল, জেনোর ধাঁধা পার্মানিডিজের যুক্তির পক্ষে কোঠা বলছে। দেখা গেল, পরিবর্তন ও গতি খুবই প্যারাডক্সিকেল ব্যাপার। তিনি মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, সবকিছু একই জিনিস। এবং পরিবর্তনহীন। জেনো সত্যিই বিশ্বাস করতেন, গতি অসম্ভব। আর এই কথার পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ তার নিজের প্যারাডক্স।

কিন্তু অন্য মতবাদের পক্ষেও ছিলেন কিছু চিন্তাবিদ। যেমন, পরমাণুবিদরা বিশ্বাস করতেন, মহাবিশ্ব পরমাণু নামে ছোট ছোট কণা দিয়ে গঠিত। পরমাণু চিরন্তন, যাকে আর ভাঙা যায় না। তাদের মতে গতি হলো এই ছোট ছোট পরমাণুর চলাচল। এই পরমাণুদেরকে চলাচল করতে হলে দরকার খালি জায়গা, যেখানে তারা গিয়ে স্থান করে নেবে। ভ্যাকুয়াম বা ফাঁকা স্থান বলে কিছু না থাকলে পরমাণুরা ক্রমাগত একে অপরের সাথে ধাক্কা খাবে। সবকিছুই চিরকাল একই জায়গায় আটকে থাকবে। চলাচল করা হত অসম্ভব। ফলে পরমাণু তত্ত্ব সঠিক হতে হলে মহাবিশ্বে থাকতে হবে ব্যাপক ফাঁকা স্থান। অসীম এক শূন্যতা। পরমাণুবাদীরা অসীম ভ্যাকুয়ামের ধারণাকে লুফে নিয়েছিল। এই ধারণার মধ্যেই অসীম ও শূন্য একাকার হয়েছিল। এ এক অবাক করা ফলাফল। কিন্তু পরমাণু তত্ত্বে বস্তুর অবিভাজ্য মৌলিক অংশ জেনোর প্যারাডক্সকে ভালোভাবেই সামাল দিয়েছিল। পরমাণুরা অবিভাজ্য বলে এমন একটি বিন্দু আছে যার পরে কোনোকিছুকে আর ভাঙা যাবে না। জেনোর ভাঙার কাজ অসীম পর্যন্ত যেতে পারে না। কিছু পদক্ষেপ ফেলার পর একিলিসের পদক্ষেপগুলো এত ছোট হবে, যার পক্ষে আরও ছোট হওয়া সম্ভব নয়। একটা সময় তিনি এমন একটি পদক্ষেপ ফেলবেন যা কচ্ছপের অতিক্রান্ত পথের চেয়ে বেশি। বারবার হাত ফসকে বেরিয়ে যাওয়া কচ্ছপ শেষমেশ ধরা পড়বেই।

পরমাণু তত্ত্বের সাথে টক্কর লাগে আরেকটি দর্শনের। এখানে অসীম ভ্যাকুয়ামের মতো অদ্ভুত কিছু ছিল না। এ ধারণা অনুসারে মহাবিশ্ব ছিল একটি নাদুসনুদুস ছোট্ট জিনিস। নেই কোনও অসীম। কোনও শূন্যতা। আছে শুধু সুন্দর কিছু গোলক। যারা বেষ্টন করে আছে পৃথিবীকে। অবচেতনভাবেই পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এটা ছিল এরিস্টটলীয় ধারণা। পরে আলেক্সান্দ্রীয় জ্যোতির্বিদ টলেমি একে পরিমার্জিত করেন। এটা পাশ্চাত্য বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দর্শনে পরিণত হয়। শূন্য আর অসীমকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে এরিস্টটল জেনোর প্যারাডক্সগুলোকে বাতিল বানিয়ে দেন।

এরিস্টটল নিছক বললেন, গণিতবিদদের অসীমকে দরকার নেই। তারা ব্যবহারও করেন না। হ্যাঁ, গণিতবিদদের মনে সম্ভাব্য কিছু অসীমের অস্তিত্ব থাকতে পারে। যেভাবে থাকে একটি রেখাকে অসীমসংখ্যক বার ভাগ করার ধারণা। কিন্তু সে কাজটি তো আর করা সম্ভব নয়। একইভাবে অসীমও বাস্তবে নেই। একিলিস সহজেই কচ্ছপকে পার হয়ে যান। কারণ অসীমসংখ্যক বিন্দুর বিষয়টি নিছক জেনোর কাল্পনিক তুলির আঁচড়। এটা বাস্তব জগতের কিছু নয়। অসীমকে নিছক মনের মধ্যে অস্তিত্বে থাকা একটি জিনিস দাবি করে এরিস্টটল অসীমকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইলেন।

এ ধারণা থেকে অত্যন্ত চমকপ্রদ একটি জিনিস বেরিয়ে আসে। এরিস্টটলীয় মহাবিশ্বের (ও পরবর্তীতে টলেমির করা পরিমার্জন) ধারণার ভিত্তি ছিল পিথাগোরীয় মহাবিশ্ব। এ ধারণায় মনে করা হত, গ্রহরা স্ফটিকের মতো গোলকের মধ্যে ঘুরছে। তবে অসীমের অস্তিত্ব নেই বলে এই গোলকের সংখ্যা সীমাহীন নয়। অন্তত একটা অবশ্য থাকবেই। সবচেয়ে বাইরের গোলক ছিল মধ্যরাতে দেখা একটি নীল গ্লোবের মতো। যা ছোট ছোট জ্বলজ্বলে আলোকবিন্দু দিয়ে আবৃত। এই আলোকবিন্দুরা হলো নক্ষত্র। সবচেয়ে বাইরের গোলকের বাইরে আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। সর্ববাইরের এই স্তরের পরে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে। মহাবিশ্বটা যেন আবদ্ধ ছিল এক বাদামের খোসায়। যা স্থির নক্ষত্রদের গোলকের ভেতরের সুন্দরভাবে অবস্থান করছিল। মহাবিশ্বটা সসীম। বস্তু দিয়ে পরিপূর্ণ। অসীম বলতে কিছু নেই। শূন্যতা বলতেও কিছু নেই। অসীম নেই বলে নেই শূন্যও।

এই যুক্তি থেকে আরও একটি ফল পাওয়া গেল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত। আর হয়ত এ কারণে এরিস্টটলের দর্শন এতগুলো বছর টিকে থাকতে পেরেছিল।

আকাশের গোলকরা নিজেদের স্থানে ধীরে ধীরে ঘুরছে। এতে করে সঙ্গীত। যা ছড়িয়ে আছে মহাবিশ্বজুড়ে। কিন্তু গোলকদের এই ঘোরার পেছনে নিশ্চয়ই কোনোকিছু ভূমিকা রাখছে। নিশ্চল পৃথিবী সেই ক্ষমতার উৎস হতে পারে না। তাহলে সবচেয়ে ভেতরের গোলক নিশ্চয় তার ঠিক বাইরের গোলক দ্বারা গতিশীল হচ্ছে। সেই গোলক আবার তার পরের গোলকের মাধ্যমে গতিশীল। এভাবেই চলছে। কিন্তু অসীম তো নেই। গোলকের সংখ্যা নির্দিষ্ট। একে অপরকে গতিশীল রাখার জন্যে আছে সসীম সংখ্যক বস্তু। গতির নিশ্চয়ই চূড়ান্ত কোনো উৎস আছে। নিশ্চয়ই কিছু একটা স্থির নক্ষত্রদের গোলককে ঘোরাচ্ছে। সেটাই প্রধান গতিদাতা ঈশ্বর। পরমাণুবাদের সাথে সম্পর্ক হলো নাস্তিকতার। এরিস্টটলীয় মত নিয়ে প্রশ্ন তোলা ছিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার সামিল।

এরিস্টটলীয় মহাবিশ্বের ধারণা অত্যন্ত সফল ছিল। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় শিষ্য আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট তাঁর মতবাদ প্রচার করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। ৩২৩ খৃষ্টপূর্বে নিজের অকাল মৃত্যুর আগে ছড়িয়ে দেন প্রাচ্যের ভারত পর্যন্ত। আলেক্সান্ডারের সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে টিকে থাকে এরিস্টটলের মতবাদ। টিকে থাকল ষোড়শ শতকের এলিজাবেথের সময় পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময় ধরে এরিস্টটলকে মেনে নেওয়া সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করে আসা হয়েছে অসীম ও শূন্যতাকে। কারণ এরিস্টটলীয় মতবাদে অসীমকে অস্বীকার করতে হলে শূন্যও থাকতে পারে না। শূন্যতার উপস্থিতি বলে অসীম বলেও কিছু একটা আছে। আর যাই হোক, শূন্যতার তো শুধু দুটিই সম্ভাব্য দিক আছে। আর দুটোই বলছে অসীমও থাকবে। প্রথমত, শূন্যতার পরিমাণ হতে পারে অসীম। মানে অসীমের অস্তিত্ব আছে। দ্বিতীয়ত, শূন্যতার পরিমাণ সসীম বা নির্দিষ্ট। আর শূন্যতা মানে বস্তুর অনুপস্থিতি। অতএব শূন্যতার পরিমাণ সসীম হতে হলে বস্তুর পরিমাণ অসীম হতে হবে। তাও অসীমের অস্তিত্ব থাকে। দুই ক্ষেত্রেই শূন্যতার অস্তিত্ব অসীমের অস্তিত্বকে অনিবার্য করে তোলে। শূন্য বা শূন্যতা এরিস্টটলের সুন্দর যুক্তিটাকে শেষ করে দেয়। বাতিল করে দেয় তাঁর করা জেনোর বক্তব্যের খণ্ডন আর ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ৮। ফলে গ্রিকরা এরিস্টটলের কথা মানার কারণে শূন্য, শূন্যতা, অসীমকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়।

একটা সমস্যা কিন্তু ছিলই। অসীম ও শূন্য দুটোকেই অবহেলা করা এত সহজ না। সময়ের সুড়ঙ্গ দিয়ে অতীতে ফিরে তাকানো যাক। ইতিহাসের পাতায় কত কত ঘটনা। অসীম বলে কিছু না থাকলে অসীম সংখ্যক ঘটনা থাকা সম্ভব নয়। তাহলে প্রথম ঘটনা বলে কিছু একটা থাকতে হবে। সেটা হবে সৃষ্টির সূচনা। কিন্তু তার আগে কী ছিল? শূন্যতা? কিন্তু এরিস্টটলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আবার কোনো প্রথম ঘটনা না থাকলে মহাবিশ্ব নিশ্চয় সবসময় অস্তিত্বে ছিল। ভবিষ্যতেও থাকলে চিরকাল। অসীম অথবা শূন্যকে মেনে নিতেই হবে। দুটোর অন্তত একটা না থাকলে মহাবিশ্ব অর্থহীন হয়ে যায়।

এরিস্টটল শূন্যতার ধারণাকে দুচোখে দেখতে পারতেন না। ফলে তিনি শূন্যতাধারী মহাবিশ্বের বদলে চির ও অসীম মহাবিশ্বের পক্ষ নিলেন। তাঁর মতে, সময়ের চিরবহমানতা জেনোর অসীম বিভাজনের৯ মতো একটি সম্ভাব্য অসীম।

ভুল হোক আর যাই হোক, পদার্থবিজ্ঞানের এরিস্টটলীয় ধারণা অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে অন্য কোনো মতবাদ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। বাতিলের খাতায় উঠেছে আরও বাস্তব তত্ত্বও। এরিস্টটলের বানানো পদার্থবিজ্ঞান আর জেনোর অসীমকে অস্বীকারের প্রবণতা থেকে সরে আসার আগে বিজ্ঞান আর অগ্রগতি করতে পারেনি।

বুদ্ধির বিড়ম্বনায় জেনো ভালোই জড়িয়ে পড়েছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৪৩৫ সালে তিনি ইলিয়ার স্বৈরচারী রাজা নিয়ারকসকে উৎখাত করার কাজে তৎপর হন। উদ্দেশ্য সাধনে তিনি অস্ত্র সরবরাহের কাজ করেন। জেনোর দূর্ভাগ্য: নিয়ারকস ষড়যন্ত্রের কথা জেনে যান। জেনোকে গ্রেফতার করা হয়। ষড়যন্ত্রকারীদের বের করতে জেনোর ওপর নির্যাতনের খড়গ নেমে আসে। অল্পতেই জেনো ভেঙে পড়লেন। সহচরদের ধরিয়ে দিতে রাজি হলেন। নিয়ারকস জেনোর কাছে আসলে জেনো তাকে আরও কাছে আসতে বললেন, যাতে নামগুলো গোপন থাকে। নিয়ারকস সামনে ঝুঁকে জেনোর দিকে মাথা বাড়াল। আচমকা জেনো নিয়ারকসের কানে দাঁত বসিয়ে দিলেন। নিয়ারকস চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু জেনোর কামড় ছাড়ার জো নেই। পাশেরনির্যাতনকারীরা জেনোকে ছুরিকাঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করে নিয়ারকসকে উদ্ধ্বার করে। আর এভাবেই মৃত্যু হয় অসীমের মহানায়কের।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য আরেকজন গ্রিক দার্শনিক অসীমের ব্যাপারে জেনোকে ছাড়িয়ে যান। তিনি আর্কিমিডিস। সিরাকিউসের খেপা গণিতবিদ। সে সময়ের চিন্তাবিদদের মধ্যে কেবল তিনিই অসীম নিয়ে চিন্তা করতে পেরেছিলেন।

সিসিলি দ্বীপে সিরাকিউস ছিল সবচেয়ে প্রাচুর্যময় শহর। আর্কিমিডিস ছিলেন এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত বাসিন্দা। তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। তবে সম্ভবত তিনি খৃষ্টপূর্ব ২৮৭ সালের দিকে সামোসে জন্মগ্রহণ করেন। পিথাগোরাসের জন্মও একই স্থানে। জন্মের পর আর্কিমিডিস সিরাকিউসে পাড়ি জমান। রাজাকে প্রকৌশলগত সমস্যার সমাধান দিতে থাকেন। সিরাকিউসের রাজাই আর্কিমিডিসকে মুকুট পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন। বলতে হবে মুকুটে খাটি সোনা আছে নাকি আছে সীসার মিশ্রণ। এ কাজটি তৎকালীন বিজ্ঞানীদের সাধ্যের অতীত ছিল।

আর্কিমিডিস গোসলের সময় পানির টাবে বসলেন। দেখলেন, টাবের কিনার দিয়ে পানি গড়িয়ে বাইরে পড়ল। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন, মুকুটটি পানিতে ডুবিয়ে এর ঘনত্ব এবং আসলত্বের পরীক্ষা করে ফেলা যায়। খেয়াল করতে হবে কতটুকু পানি বাইরে পড়ে যাচ্ছে। দারুণ উপলদ্ধির প্রভাবে আর্কিমিডিস নগ্ন অবস্থায়ই টাব থেকে লাফিয়ে নেমে সিরাকিউসের রাস্তা ধরে ছুটলেন, "ইউরেকা! ইউরেকা!”

আর্কিমিডিসের মেধা সিরাকিউসের সামরিক বাহিনীরও কাজে এসেছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতকে গ্রিকদের আধিপত্যের ইতি ঘটে। আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের পতন হয়ে আলাদা আলাদা রাজ্য তৈরি হয়। যারা একে অপরের সাথে বিবাদ করতে থাকে। পাশ্চাত্যে রোমকরা নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে শুরু করে। রোমকরা সিরাকিউসের দিকে নজর দেয়। গল্পে আছে, আর্কিমিডিস রোমকদের থেকে সিরাকিউসকে রক্ষা করতে নগরবাসীকে অলৌকিক অস্ত্রের যোগান দেয়। এর মধ্যে ছিল পাথর নিক্ষেপক। ছিল ক্রেন, যা রোমকদের জাহাজকে শূন্যে ছুঁড়ে মারত পানিতে। ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের দর্পণ। সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে এ দর্পণ অনেক দূর থেকে রোমকদের জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়। রোমক সৈন্যরা এসব যন্ত্রের খেল দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অবস্থা এমন হলো, এসব সৈন্যরা দেয়ালের ওপর দিয়ে কোনো রশি বা কাঠের চিহ্ন দেখলেও ভয়ে পালিয়ে যেত। না জানি আর্কিমিডিস কোন অস্ত্র তাক করবে তাদের দিকে!

আর্কিমিডিস অসীমের দেখা প্রথম পেয়েছিলেন তার যুদ্ধের দর্পণের কাঁচে। কনিক বা চোঙের মতো জিনিসের প্রতি গ্রিকরা বহু শতাব্দী ধরেই আকৃষ্ট ছিল। (কোন হলো ঝালমুড়ির প্যাকেটের মতো। কলার মোচাও একই আকৃতির।--অনুবাদক) একটি কোন নিয়ে একে ব্যাসার্ধ বরাবর কাটুন। কীভাবে কাটছেন তার ওপর নির্ভর করে পাওয়া যাবে বৃত্ত, উপবৃত্ত, পরাবৃত্ত বা অধিবৃত্ত। পরাবৃত্তের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। সূর্য বা দূরবর্তী কোনো উৎসের আলোকে এটি একটি বিন্দুতে মিলন ঘটায়। ফলে আলোর সবটুকু শক্তি একটি জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়। জাহাজকে পোড়ানোর জন্যেও পরাবৃত্তের মতো দেখতে একটি দর্পণ লাগবে। আর্কিমিডিস পরাবৃত্তের বৈশিষ্ট্য জেনেছিলেন। আর ঠিক এখানেই অসীম নিয়ে তাঁর খেলার শুরু।

পরাবৃত্ত বুঝতে গিয়ে আর্কিমিডিসকে এর পরিমাপ করার উপায় শিখতে হয়েছিল। পরাবৃত্তের খণ্ডিত অংশের ক্ষেত্রফল বের করার নিয়ম কারোই জানা ছিল না। ত্রিভুজ ও বৃতের পরিমাপ খুব সহজ ছিল। কিন্তু এর চেয়ে একটি বিষম বাহুর কার্ভের পরিমাপ সে সময়কার গ্রিক গণিতবিদদের সাধ্যের অতীত ছিল। পরাবৃত্তও ছিল তাই। তবে অসীমের আশ্রয় নিয়ে আর্কিমিডিস পরাবৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার বুদ্ধি বের করে ফেলেন। প্রথম কাজ হলো পরাবৃত্তের ভেতরে একটি ত্রিভুজ বসিয়ে দেওয়া। এর ফলে দুই দিকে দুটি ছোট ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে। ফাঁকা জায়গা দুটিতে আর্কিমিডিস আরও ত্রিভুজ বসালেন। এর ফলে ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল চারটি। বসানো হলো আরও ত্রিভুজ। এভাবেই চলল খেলা। (চিত্র ১২)

এ যেন একিলিজ ও কচ্ছপের গল্পের মতো।১ যেখানে রয়েছে অসীম সংখ্যক কাজের ধাপ। প্রতিটি ধাপ আগের ধাপের চেয়ে ছোট। ছোট ছোট ত্রিভুজগুলোর ক্ষেত্রফল খুব দ্রুত শূন্যের কাছাকাছি চলে আসে। অনেকগুলো জটিল হিসাব-নিকাশ শেষে আর্কিমিডিস অসীমসংখ্যক ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি বের করেন। পেয়ে যান পরাবৃত্তের ক্ষেত্রফল। সেসময়ের গণিতবিদদের কাছে কাজটা হাস্যকর। আর্কিমিডিস অসীম নিয়ে খেলা করেছেন। তাঁর গণিতবিদ বন্ধুদের কাছে এ এক নিষিদ্ধ কাজ। তাদেরকে খুশী রাখতে অবশ্য আর্কিমিডিস একটি প্রমাণও হাজির করেছেন। সেময়ের স্বীকৃত গাণিতিক ধারণাই কাজে লাগিয়েছেন তাতে। এতে ব্যবহার করেছেন তথাকথিত আর্কিমিডিসের উপপাদ্য। আর্কিমিডিস অবশ্য স্বীকার করেছেন, এই উপপাদ্য আগের গণিতবিদদের দান। আপনাদের হয়ত মনে আছে, এই উপপাদ্য বলছে, যেকোনো সংখ্যাকে নিজের সাথে বারবার যোগ করলে যোগফল যেকোনো সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে শূন্য অবশ্যই এই নিয়মের মধ্যে পড়বে না।

লিমিট ও ক্যালকুলাস প্রকৃত অর্থে আবিষ্কারের আগে আর্কিমিডিসের ত্রিভুজের মাধ্যমে করা এই প্রমাণই এই ধারণাগুলোর সবচেয়ে কাছাকাছি জিনিস। পরবর্তীতে আর্কিমিডিস রেখার সাপেক্ষে ঘূর্ণায়মান পরাবৃত্ত ও বৃত্তের আয়তনও বের করে দেখান। বর্তমানে ক্যালকুলাসের শিক্ষার্থীরা ক্যালকুলাস শেখার শুরুতেই এসব সমস্যা নিয়ে কাজ করে। কিন্তু আর্কিমিডিসের উপপাদ্যে ছিল না শূন্যের ঠাঁই। অথচ শূন্যই সসীম ও অসীমের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। এমন এক সেতু, যা ক্যালকুলাস ও উচ্চতর গণিতের জন্যে অনিবার্য।

সমকালীনদের মতো আর্কিমিডিসও অনেকসময় অসীমকে তাচ্ছিল্য করেছেন। তিনি এরিস্টটলীয় মহাবিশ্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এ মহাবিশ্ব ছিল বিশাল এক গোলকের অভ্যন্তরে। একবার তার মাথায় চাপল অদ্ভুত এক খেয়াল। তিনি ভাবলেন, পুরো (গোলকীয়) মহাবিশ্বে কতটি বালুকণা আঁটবে তা হিসাব করবেন তিনি। *স্যান্ড রেকোনার* লেখায় তিনি হিসাব কষে দেখলেন, একটি পোস্তদানায় (আফিমের বীজ) কয়টি দানা ধরবে। এরপর বের করলেন কয়টি পোস্তদানা আঙ্গুলের সমান চওড়া হবে। আঙ্গুলের প্রস্থ থেকে গেলেন স্টেডিয়ামের (বেশী দূরত্ব মাপতে এটাই ছিল গ্রিকদের প্রধান একক) দৈর্ঘ্যে। এভাবে পৌঁছে গেলেন মহাবিশ্বের সাইজ পর্যন্ত। আর্কিমিডিসের হিসাব অনুসারে পুরো মহাবিশ্বকে ১০৫১ টি বালুকণা দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ করা যাবে। যার ফলে (এরিস্টটলীয় মহাবিশ্বের) বাইরের স্থির তারকার গোলকও বালুতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠবে। (১০৫১ কিন্তু আসলেই বড়সড় এক সংখ্যা। ধরুন আপনার কাছে ১০৫১ টি পানির অণু আছে। বর্তমানে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সবাই মিলে প্রতি সেকেন্ডে এক টন করে পানি পান করলে সবটুকু পানি শেষ করতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার বছর লাগবে।) এই সংখ্যা এতই বড় ছিল যে গ্রিকদের গণনাবিদ্যা এর কাছে এসে পরাস্ত হয়। বিশাল বড় সংখ্যাদের প্রকাশ করার জন্যে আর্কিমিডিসকে একেবারে নতুন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হয়।

গ্রিক সংখ্যাপদ্ধতিতে ১০,০০০ (অযুত) ছিল সবচেয়ে বড় গুচ্ছ। অযুতের সাহায্যে গ্রিকরা অযুত অযুত (১০ কোটি) সংখ্যাকেও প্রকাশ করতে পারত। আরও কিছুটাও যেতে পারত আরও বড় সংখ্যার দিকে। কিন্তু একটি নতুন চিন্তার সূচনা করে আর্কিমিডিস এই বাধা পেরিয়ে যান। তিনি শুরু করেন খুব সরলভাবে। শুরুতে ১০ কোটিকে ধরে নিলেন ১। আবার গণনা শুরু করে সংখ্যাগুলোকে নাম দিলেন দ্বিতীয় ক্রমের সংখ্যা। (আর্কিমিডিস ১০০,০০,০০,০০১কে ১ ধরেননি। ১০০,০০,০০,০০০কেও ০ ধরেননি। আধুনিক গণিতবিদেরা যদিও সেটাই করবেন। আর্কিমিডিস খেয়াল করেননি, ০ থেকে শুরু করাই বেশি যুক্তিযুক্ত হত।) দ্বিতীয় ক্রমের সংখ্যারা অযুত অযুত থেকে চলে এল অযুত অযুত অযুত অযুতে। তৃতীয় ক্রমের সংখ্যারা হলো অযুত অযুত অযুত অযুত অযুত অযুত বা ১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০। এভাবে যেতে যেতে তিনি গেলেন ১০ কোটিতম ক্রম পর্যন্ত। এদেরকে তিনি নাম দেন প্রথম যুগের সংখ্যা। কাজটি সুখকর ছিল না। তবে কাজ তাতে হয়ে গেছে। নিজের চিন্তন পরীক্ষা করতে আর্কিমিডিসের যা প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে বেশিই হয়েছে। কিন্তু সংখ্যাগুলো বড় হলেও ছিল সসীম। মহাবিশ্বকে বালু দিয়ে ভর্তি করতে যত বালু লাগবে সে সংখ্যার চেয়ে বেশি। গ্রিক মহাবিশ্বে অসীমের দরকার পড়েনি।

আরও সময় পেলে হয়ত আর্কিমিডিস অসীম ও শূন্যের আকর্ষণ দেখতে শুরু করতেন। কিন্তু স্যান্ড রেকোনার (বালু গণনাকারী) বালু গুনতে গুনতে নিয়তির সাক্ষাৎ পেয়ে গেলেন। রোমকদের মোকাবেলা করার ক্ষমতা সিরাকিউসবাসীর ছিল না। সিরাকিউসের পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের জনবল ছিল দুর্বল। দেয়ালগুলো বেয়ে সহজেই এপারে চলে আসা যেত। এর ফলে রোমানরা কিছু সৈন্যকে শহরের ভেতরে পাঠিয়ে দেয়। রোমানরা শহরে ঢুকে পড়েছে বুঝতে পেরে সিরাকিউসবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। আত্মরক্ষার মনোবল গেল ভেঙে। রোমানরা শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আর্কিমিডিসের সেদিকে মন দেওয়ার সময় ছিল। তিনি মাটিতে বসে বালুতে বৃত্ত আঁকছিলেন। চেষ্টা করছিলেন একটি উপপাদ্য প্রমাণ করতে। এক রোমক সৈন্য ৭৫ বছর বয়সী আলুথালু আর্কিমিডসকে দেখে পেছন পেছন যেতে বলল। আর্কিমিডিস মানলেন না। কারণ প্রমাণ তখনও শেষ হয়নি। সৈন্যটি রেগে গিয়ে তাঁর গর্দান কেতে ফেলল। এভাবেই রোমকদের অপ্রয়োজনীয় হত্যার শিকার হয়ে মারা যান প্রাচীন বিশ্বের সবচেয়ে মেধাবী মানুষটি। গণিতের জগতে রোমানদের সবচেয়ে বড় অবদান হলো আর্কিমডিসের হত্যা। রোমকরা প্রায় সাত শতাব্দী শাসন ক্ষমতায় ছিল। এই পুরো সময়ে গণিতের বড় কোনো অগ্রগতি নেই। সময় তো আর থেমে থাকে নি। ইউরোপে খ্রিষ্টধর্মের প্রসার হয়েছে। রোমানদের পতন হয়েছে। আলেক্সান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পুড়েছে। শুরু হয়েছে অন্ধকার যুগ। আরও সাত শতাব্দী পরে পাশ্চাত্যে শূন্য ফিরে আসে।

এর মাঝে আবার দুজন সন্ন্যাসী শূন ছাড়াই একটা ক্যালেন্ডার বানালেন। যা আমাদেরকে চিরকালের জন্যে বিভ্রান্তির সাগরে ডুবিয়ে দেয়।

**অন্ধ অভিসার**

*এ এক তুচ্ছ ও শিশুসুলভ আলাপ। আমাদের বক্তব্যের বিরোধীতাকারীদের নির্বুদ্ধিতারই বহিঃপ্রকাশ এটি।*

- দ্য টাইমস (লন্ডন), ২৬ ডিসেম্বর, ১৭৯৯

এই 'তুচ্ছ ও শিশুসুলভ' আলাপটি হলো নতুন শতাব্দীর সূচনা নিয়ে। নতুন শতাব্দী কি ০০ তে শুরু হবে, নাকি ০১ থেকে। এই আলাপটি এক শ বছর পরপর ঘড়ির কাঁটার মতো ফিরে ফিরে আসে। মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসীরা শূন্যের কথা জানলে ক্যালেন্ডার নিয়ে এই ঝামেলায় পড়া লাগত না।

তবে না জানার জন্য সন্ন্য্যাসীদের দোষ দেওয়া যায় না। আসলে মধ্য যুগের পশ্চিমে শুধু খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীরাই গণিত নিয়ে পড়াশোনা করেছে। শুধু তাদের মধ্যেই কিছু বিজ্ঞ লোক খুঁজে পাওয়া যেত। দুটি কারণে তাদের গণিতের প্রয়োজন পড়েছিল। প্রার্থনা আর অর্থ। টাকা গুনতে তাদের জানতে হয় কীভাবে...হুম...টাকা গুনতে হয়। এর জন্যে তারা ব্যবহার করত অ্যাবাকাস বা কাউন্টিং বোর্ড। কাউন্টিং বোর্ডও অ্যাবাকাসের মতো ছিল। যেখানে পাথর বা এমন কিছুকে টেবিলের ওপর চালাচালি করা হত। কাজটায় অত সৃজনশীল ছিল না। তবে প্রাচীন সময়ের কথা চিন্তা করলে সেটাই ছিল অত্যাধুনিক। আবার প্রার্থনার জন্য পূজারীদের সময় ও তারিখ জানা লাগত। ফলে পূজারীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য সময়গণনা ছিল অপরিহার্য। নিয়মিত বিরতিতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনা করতে হত। (ইংরেজি noon বা দুপুর শব্দটি এসেছে nones থেকে। যার অর্থ হলো মধ্যযুগের দিনের মধ্যভাগের প্রার্থনা) সময় না জানলে রাতের প্রহরী কীভাবেই বা সঙ্গীদের আরামের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত হতে বলবে? একটা ভাল ক্যালেন্ডার না থাকলে কীভাবে জানা যাবে কখন ইস্টার১০ উদযাপন করতে হবে? এটা ছিল এক বড় সমস্যা।

ইস্টারের তারিখ বের করা সহজ কোনো কাজ ছিল না। এক ক্যালেন্ডারে তারিখ আসে একেকটা। গির্জার কেন্দ্র ছিল রোমে। আর খ্রিষ্টানরা ব্যবহার করত রোমান সৌর ক্যালেন্ডার। এতে দিনের সংখ্যা ছিল মোটামুটি ৩৬৫। কিন্তু যিশু (আ) ছিলেন জাতিতে ইহুদী। তিনি তাই ব্যবহার করতেন ইহুদীদের চান্দ্র পঞ্জিকা। যেটায় দিনের সংখ্যা মাত্র ৩৫৪-এর মতো। যিশুর (আ) জীবনে বড় ঘটনাগুলো চান্দ্র মাসের তারিখ দিয়ে নথিভূক্ত আছে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে সূর্যের ভূমিকা বেশি। ক্যালেন্ডার দুটির তারিখে গরমিল সবসময় হতেই থাকে। ফলে ছুটির দিন বের করা কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ইস্টারও এমন একটি গরমিলের কবলে পড়া ছুটির দিন। এ কারণে কয়েক প্রজন্ম পর পর একজন সন্ন্যাসীকে দায়িত্ব দেওয়া হত পরের ১০০ বছরের ইস্টারের তারিখ বের করে রাখার জন্য।

দিওনিসিউস এক্সিগুস ছিলেন এমন একজন সন্ন্যাসী। ষষ্ঠ শতকে পোপ ১ম জন তাকে ইস্টারের তারিখগুলো আরও বেশি বের করে রাখার জন্য বলেন। তারিখগুলোকে রূপান্তর ও নতুন হিসাব করতে গিয়ে দিওনিসিউস একটু গবেষণা চালালেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি যিশুর (আ) জন্মতারিখও বের করতে পারবেন। কিছু সময় গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করে তিনি ঠিক করলেন বর্তমান বছর হলো যিশুর (আ) জন্মের ৫২৫তম বছর। দিওনিসিউস ভাবলেন, যিশুর জন্ম বছরই ১ম বছর বা ১ম খ্রিষ্টাব্দ হওয়া উচিত। অবশ্য দিওনিসিউস বলেছিলেন, খ্রিষ্টের জন্ম হয়েছিল আগের বছরের ২৫ ডিসেম্বরে। কিন্তু তিনি ১ জানুয়ারির ১ তারিখে ক্যালেন্ডার শুরু করেন রোমান বর্ষের সাথে মিল রাখার জন্য। তার পরবর্তী বছর ছিল ২য় খ্রিষ্টাব্দ, পরেরটা ৩য় খ্রিষ্টাব্দ ইত্যাদি। এর মাধ্যমে আগের বহুল প্রচলিত দুটি তারিখ নির্ধারণ পদ্ধতির জায়গায় নতুন এ নিয়ম আসল১১। কিন্তু সমস্যা একটা থেকে গেল। আসলে দুটি।

প্রথম কথা হলো, দিওনিসিউস যিশুর (আ) ভুল জন্মতারিখ বের করে। বিভিন্ন সূত্রের ঐকমত্য থেকে জানা যায়,রাজা হেরোড নবজাতক মসীহ (আ) সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিলেন। এ কারণে মেরি ও জোসেফ রাজার আক্রোশ থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু হেরোড মারা যান খ্রিষ্টপূর্ব তিন সালে। মানে খ্রিষ্টের (আ) জন্মের কয়েক বছর আগেই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, দিওনিসিউসের ভুল হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, খ্রিষ্টের (আ) জন্ম হয়েছিল চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্ব সালে। দিওনিসিউসের হিসাবে কয়েক বছরের ভুল হয়েছিল।

সত্যি বলতে এ ভুল কিন্তু অত মারাত্মক কিছু নয়। ক্যালেন্ডারের প্রথম বছর বাছাই করার ক্ষেত্রে কোন বছর বাছাই করা হলো তা অত গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে পরের সব হিসাব হতে হবে নির্ভুল। চার বছরের ভুলে কোনো ক্ষতি নেই, যদি সবাই ভুলটার ব্যাপারে মেনে নেয়। যেমন আমরা মানলাম। কিন্তু দিওনিসিউসের ক্যালেন্ডারে আরও মারাত্মক এক সমস্যা ছিল। আর তা হলো শূন্য।

শূন্যতম বছর ছিল না এতে। এমনিতে এতে কোনো অসুবিধা নেই। সে সময়ের বেশিরভাগ ক্যালেন্ডার প্রথম বছর থেকে শুরু। শূন্য নয়। শূন্যতে শুরু করার কোনো উপায়ই দিওনিসিউসের ছিল না। তিনি শূন্যের কথা জানতেনই না। তিনি বেড়ে ওঠেন রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর। রোমানদের স্বর্ণযুগেও গণিতে ভাল কিছু করে দেখাতে পারেনি। ৫২৫ সালে শুরু অন্ধকার যুগের। পশ্চিমারা গোলমেলে রোমান পদ্ধতির সংখ্যা ব্যবহার করা শুরু করল। এই গণনাপদ্ধতিতে কোনো শূন্য ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই দিওনিসিউস যিশুর (আ) জন্মের প্রথম বছর হবে বছর নং ১ (I)। পরের বছর হবে II। আর দিওনিসিউস এ সিদ্ধান্ত নেন DXXVতম বছরে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এতে কোনো অসুবিধা নেই। আর তাছাড়া দিওনিসিউসের ক্যালেন্ডার তখনো অত জনপ্রিয় হয়নি। ৫২৫ সালে রোমান রাজ দরবারের বুদ্ধিজীবিরা এক মহা সমস্যায় পড়ল। পোপ জন মারা গেলেন। ক্ষমতার পালাবদল হলো। সব দার্শনিক ও দিওনিসিউসের মতো গণিতবিদদেরকে দরবার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। তাও ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। অন্তত প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরছেন। (অন্যরা এত ভাগ্যবান ছিলেন না। অ্যানিসিউস বোথিউস ছিলেন প্রভাবশালী দরবারী। মধ্যযুগের অন্যতম পাশ্চাত্য গণিতবিদ।উল্লেখযোগ্য এক ব্যক্তিত্ব। দিওনিসিউসকে অফিস থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রায় একই সময়ে বোথিয়াসও ক্ষমতা হারান। বন্দী করা হয় তাকে। বোথিয়াস ইতিহাসে ঠাঁই অবশ্য গণিতের জন্য পাননি। পেয়েছেন তার দ্য *কন্সোলেশন অব ফিলোসফি* (দর্শনের সান্ত্বনা) গ্রন্থের জন্য। এখানে তিনি এরিস্টটলীয় ধরনের দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীতে তাকে পিটিয়ে মারা হয়।) যাই হোক,বছরের পর বছর এই দুর্বলতা নিয়ে চলতে থাকে নতুন পঞ্জিকা।

নতুন পঞ্জিকায় শূন্য নেই। সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে দুই শতাব্দী পরে। ৭৩১ সালের দিকে দিওনিসিউসের ইস্টার টেবিল ফুরিয়ে আসছে। উত্তর ইংল্যান্ডের ক্রমেই শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠা সন্ন্যাসী বিড টেবিলটাকে আবারও বড় করলেন। সম্ভবত এভাবেই তিনি দিনিওসিউসের কথা জানতে পেরেছিলেন। বিড ব্রিটেনের গির্জার ইতিহাস লিখেছিলেন *দ্য ইক্লেসিয়েসটিক্যাল হিস্ট্রি অব দ্য ইংলিশ পিপল* বইয়ে। এখানে তিনি ব্যবহার করেছেন নতুন পঞ্জিকা।

বইটি অসাধারণ সাফল্য পায়। কিন্তু এতে ছিল মস্ত বড় এক ভুল। বিড খ্রিষ্টপূর্ব ৬০ সাল থেকে ইতিহাস শুরু করেন। মানে দিনিওসিউসের মূল বর্ষ থেকে অনেক আগেই। বিড নতুন তারিখ পদ্ধতি এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলেন না। তিনি তিনি দিনিওসিউসের পঞ্জিকাকে পেছন দিকে লম্বা করে নিলেন। বিডও কিন্তু শূন্যের কথা জানতেন না। প্রথম খ্রিষ্টাব্দের আগের বছরটি তাই ছিল খ্রিষ্টপূর্ব এক। শূন্যতম বছরের অস্তিত্ব ছিল না।

প্রথম দৃষ্টিতে এই ক্রমিক পদ্ধতিকে খারাপ কিছু মনে হবে না। কিন্তু এটা ঝামেলা ঠিকই বাঁধিয়েছে। খ্রিষ্টাব্দগুলোকে ধনাত্মক আর খ্রিষ্টপূর্ব সালগুলোকে ঋণাত্মক সাল মনে করুন। বিডের গণনাপদ্ধতি ছিল: ..., -৩, -২, -১, ১, ২, ৩, ...। শূন্যের জায়গা হওয়া উচিত ছিল -১ ও ১ এর মাঝে। কিন্তু শূন্যকে রাখা হয়নি। সবাইকে যা ঠেলে দিল ভুলের দিকে। ১৯৯৬ সালে ওয়াশিংটন পোস্টে পঞ্জিকা নিয়ে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখক সবাইকে সহস্রাব্দ বিতর্ক (মিলেনিয়াম কন্ট্রোভার্সারি) নিয়ে চিন্তা করার উপায় বাতলে দেন। এরপর কোনো কিছুই না ভেবে বলে দিলেন, যেহেতু যিশুর (আ) জন্ম চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্ব সালে, ১৯৯৬ হলো তাঁর জন্মের ২০০০তম বছর। দেখে একেই সঠিক মনে হয়। (১৯৯৬-(-৪)) = ২০০০। কিন্তু ভুল। আসলে এটা হবে ১৯৯৯তম বছর।

ধরুন একটি বাচ্চার জন্ম হলো চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্ব সালের জানুয়ারির ১ তারিখে। তৃতীয় খ্রিষ্টপূর্ব সালে তার বয়স এক বছর। দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্ব সালে বয়স দুই। খ্রিষ্টপূর্ব এক সালে বয়স তিন। প্রথম খ্রিষ্টাব্দে তার বয়স দাঁড়াল চারে। দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দে তার বয়স হবে পাঁচ। দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারির ১ তারিখ পর্যন্ত তার জন্মের পর কত বছর সময় অতিবাহিত হলো? অবশ্যই পাঁচ বছর। কিন্তু বছর বিয়োগ করে এটা পাওয়া যাবে না। ২-(-৪) = ৬। ভুল হচ্ছে শূন্যতম বছর না থাকার কারণে।

আসলে শূন্যতম খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাচ্চাটির বয়স চার হওয়ার কথা। প্রথম খ্রিষ্টাব্দে পাঁচ ও দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দে ছয়। এভাবে হিসাব করে গেলে সব সংখ্যা ঠিকভাবে কাজ করবে। বাচ্চার বয়স বের করতে হলে সরল একটি বিয়োগ করতে হবে। ২ থেকে -৪। কিন্তু তা নয়। ঠিক ফল পেতে হলে যোগফল থেকে আরও বাড়তি এক বিয়োগ করতে হবে। অতএব, ১,৯৯৬ সালে যিশুর (আ) বয়স ২,০০০ বছর ছিল না। ছিল ১,৯৯৯। ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর। তার চেয়েও খারাপ আসলে।

ধরুন একটি বাচ্চার জন্ম হলো প্রথম বছরের প্রথম দিনের প্রথম সেকেন্ডে। প্রথম খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারির ১ তারিখে। দ্বিতীয় বছরে তার বয়স হবে এক, তৃতীয় বছরে দুই ইত্যাদি। ৯৯তম বছরে তার বয়স হবে ৯৮। ১০০তম বছরে ৯৯ বছর। এবার ধরুন বাচ্চার নাম দেওয়া হলো শতক। ১০০তম বছরে শতকের বয়স ৯৯। সে তার ১০০তম জন্মদিন পালন করবে ১০১তম বছরের জানুয়ারির ১ তারিখে। তার মানে দ্বিতীয় শতাব্দী শুরু হবে ১০১ সালে। একইভাবে তৃতীয় শতাব্দী শুরু হবে ২০১ সালে। আর বিংশ শতাব্দী ১৯০১ সালে। এর অর্থ হলো একবিংশ শতাব্দী বা তৃতীয় সহস্রাব্দ শুরু হবে ২,০০১ সালে। সহজে হয়ত ব্যাপারটা চোখে পড়ে না।

১,৯৯৯ সালের ডিসেম্বরের ৩১ তারিখে সব হোটেল-রেস্টুরেন্ট অগ্রিম বুক হয়ে গেল। ২০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বরে নয় কিন্তু। সহস্রাব্দ উৎসব সবাই করল ভুল তারিখে। উৎসবকারীদের উৎসাহের কাছে হার মানল রয়েল গ্রিনউইচ মানমন্দিরও। অথচ পৃথিবীর সময় সংরক্ষণ ও তারিখের গোলমাল সমাধানের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব তাদেরই। মানমন্দিরের পারমাণবিক ঘড়ি এগিয়ে চলছে। আর নিচে ওদিকে মানুষ আশায় বসে আছে, সরকারি অর্থায়নে মহোৎসব হবে। হবে স্মরণীয় এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আয়োজকরা তারিখ ঠিক করে রেখেছে ৩১ ডিসেম্বর, ১,৯৯৯। অনুষ্ঠান শেষ ২,০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর, যখন কিনা মাত্র মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদরা সহস্রাব্দ উৎসব শুরু করেছেন।

জ্যোতির্বিদরা অন্যদের মতো করে সময় নিয়ে খেলতে পারেন না। তারা নজর রাখেন মহাকাশে। মহাকাশের ঘড়ি অধিবর্ষে ধাক্কা খায় না। মানুষ পঞ্জিকা বদলাতে চাইলেই বদলে যায় না মহাকাশ। এ কারণে জ্যোতির্বিদরা মানুষের পঞ্জিকাকে এড়িয়ে চললেন। তারা যিশুর (আ) জন্ম থেকে বছর গণনা করেন না। তারা গণনা শুরু করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭১৩ সালের জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে। এ সালটা মোটামুটি ঝামেলাবিহীন সংখ্যা। ১৫৮৩ সালে পণ্ডিত জোসেফ স্ক্যালিগার তারিখটি ঠিক করেন। তার বানানো জুলিয়ান তারিখ মহাকাশের ঘটনার তারিখের হিসাব রাখার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। জুলিয়ান (জুলীয়?) তারিখগুলো জুলিয়ান পঞ্জিকা থেকে আলাদা। এর নামকরণ হয়েছে স্ক্যালিগারের বাবার নাম থেকে। জুলিয়াস সিজার নয়। এ তারিখগুলোতে একের পর এক সংশোধন করতে থাকা পঞ্জিকাগুলোর মতো ঝামেলা ছিল না। পরে অবশ্য এ পদ্ধতিতে একটু পরিবর্তন এসেছে। পরিমার্জিত জুলীয় তারিখ একদম ২৪,০০,০০০ দিন ও ১২ ঘণ্টা কম। এতে শূন্যতম ঘণ্টা পড়েছে ১,৭১,৮৫৮ সালের মধ্যরাতে। এটাও মোটামুটি সাধারণ এক সংখ্যা।

জ্যোতির্বিদরা হয়ত পরিমার্জিত ৫১,৫৪২ জুলীয় তারিখ উদযাপন করতে চাইবেন না। ইহুদিরা এড়িয়ে যাবে ৫৭৬০ সালের ২৩ তেভেত (ইহুদি পঞ্জিকার দশম মাস)। মুসলমানরা ভুলে যাবে ১,৪২০ সালের ২৩ রমাদান। তবে দ্বিতীয়বার ভাবলে হয়ত তারা এমনটা করবে না। সবাই বুঝতে পারবে তারিখটা হলো আসলে ১,৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর। আর ২,০০০ সালটার মধ্যে আছে বিশেষ কিছু একটা।

ঠিক কী কারণে তা জানা না গেলেও আমরা মানুষরা সুন্দর সংখ্যা ভালোবাসি। ভালোবাসি এমন সংখ্যা যাতে আছে অনেক অনেক শূন্য। আমরা ৯৯'র পরে ১০০ দেখার জন্য বসে থাকি। ৯৯৯-এর পরে বসে থাকি ১,০০০ এর জন্য। বাচ্চারা ১০০, ১০০০ দেখলে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে।

**শূন্যতম সংখ্যা**

পোলিশ গণিতবিদ ওয়াক্ল সিয়েপিন্সকি চিন্তিত হয়ে ভাবছেন লাগেজের আরেকটা ব্যাগ কোথায় গেল। স্ত্রী বলল, "প্রিয়, ছয়টি ব্যাগই তো আছে।" "তা কীভাবে হয়? আমি তো কয়েকবার গুনলাম: ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫।

~ দ্য বুক অব নাম্বারস, জন কওনয়ে ও রিচার্ড গাই

দিওনিসিউস ও বিড পঞ্জিকায় শূন্যকে না রেখে ভুল করে ফেলেছিলেন। ব্যাপারটা শুনতে হয়ত অদ্ভুত লাগবে। কারণ বাচ্চার এক, দুই, তিন ... এভাবে গোনে। শূন্য, এক, দুই... এভাবে না। মায়ানরা ছাড়া আর কারও শূন্যত বছর ছিল না। কেউ মাসের শুরু করেনি শূন্য দিন থেকে। একে অস্বাভাবিক লাগে। তবে পেছন দিকে গুনতে গেলে সেটাই আবার স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়।

দশ, নয়, আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক। শুরু!

স্পেস শাটল মহাশূন্যে ছুটে যাবার আগে শূন্যের জন্যে অপেক্ষা করে। শূন্যতম ঘণ্টায় ঘটে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথম ঘণ্টায় নয়। বোমার বিস্ফোরণস্থলের দিকে যেতে থাকলে আপনি যেতে থাকেন গ্রাউন্ড জিরোর দিকে।

ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে, মানুষ আসলে শূন্য থেকে গণনা শুরু করে। স্টপওয়াচ চলতে শুরু করে ০:০০:০০ থেকে। এক সেকেন্ড পরে দেখা যায় ০:০১:০০। নতুন গাড়ির অডোমিটারে (দূরত্ব পরিমাপক) লেখা থাকে ০০০০০। যদিও কেনার আগে কিছু পথ গাড়িটা চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। সেনাবাহিনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে দিন শুরু হয় ০০০০ ঘণ্টায়। কিন্তু কোনো কিছু গুণতে গেলেই আমরা এক থেকে শুরু করে জোরে জোরে গুণতে থাকি। তবে গণিতবিদ বা কম্পিউটার প্রোগ্রামাররা১২ আলাদা।

১, ২, ৩,... ইত্যাদি গণনাবাচক সংখ্যা নিয়ে কাজ করলে সহজেই ক্রম অনুসারে সাজানো যায়। এক হলো প্রথম গণনাবাচক সংখ্যা, দুই হলো দ্বিতীয় গণনাবাচক সংখ্যা আর তিন হলো তৃতীয়। সংখ্যা আর ক্রম নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি নেই। দুটো একই। বহু বছর ধরে এভাবেই সব চলছিল। সবাই তাতে খুশী। কিন্তু শূন্যের আগমনে সংখ্যা আর ক্রমের নির্ভেজাল সম্পর্কে ছেদ পড়ল। সংখ্যারা হলো এমন: ০ , ১, ২, ৩,...। প্রথম সংখ্যা শূন্য। দ্বিতীয়টি এক। তৃতীয় সংখ্যা হলো দুই। সংখ্যা আর ক্রম এক থাকল না। পঞ্জিকার সমস্যার মূল কারণ এটাই।

দিনের প্রথম ঘণ্টা শুরু হয় মধ্যরাতের পরের শূন্যতম সেকেন্ডে। দ্বিতীয় ঘণ্টার শুরু রাত একটায়। আর তৃতীয় ঘণ্টা শুরু রাত দুটোয়। আমরা গুনি ক্রমবাচক সংখ্যা দিয়ে (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়)। কিন্তু সময়ের হিসাব হয় সংখ্যাবাচক (০, ১, ২)। যেমন, রাত ২টা ৩০ মিনিট মানে হলো তৃতীয় ঘণ্টার ৩০ মিনিট পার হয়েছে। পছন্দ করই আর নাই করি এটা আমরা সবাই মেনে নিয়েছি। একটি বাচ্চা ১২ মাস পার করলে আমরা বলি তার এক বছর হয়েছে। সে তার জীবনের প্রথম ১২ মাস পূর্ণ করেছে। এক বছর পরে বয়স এক হয়ে থাকলে তার আগে বয়স কি শূন্য হবে না? হ্যাঁ, আমরা বলতেই পারি বাচ্চাটির বয়স ৬ সপ্তাহ বা ৯ মাস ইত্যাদি। শূন্যকে এড়িয়ে যাওয়ার ভালোই বুদ্ধি।

দিনিওসিউস শূন্যের কথা জানত না। তার পঞ্জিকা তাই শুরু হয় এক নং বছর থেকে। ঠিক যেভাবে কাজটা করেছে তার পূর্বপুরুষরা। সে সময়ের মানুষরা পুরনো পদ্ধতির সংখ্যা ও ক্রমের সমতুল্যতার ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করত। এতে তাতের কোনো অসুবিধা হত না। তাদের মাথায় শূন্য না আসলে এ ব্যাপারটিতে কোনো সমস্যাই ছিল না।

**বিশাল শূন্যতা**

তা একদম শূন্যতা ছিল না। সেটা ছিল সংজ্ঞাহীন এক ধরনের আকারহীনতা। ... সত্যিকার যুক্তি আমাকে বুঝিয়ে দেয়, পরম আকারহীনতাকে বুঝতে হলে সব ধরনের আকারের অবশিষ্টাংশ আমাকে মন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে হবে। আমি তা পারিনি।

~ সেন্ট অগাস্টিন, কনফেশনস

সন্ন্যাসীদেরকে এর জন্য আসলে দোষ দেওয়া যায় না। দিওনিসুয়স এক্সিগিউস, বোথিয়াস ও বিডদের পৃথিবী ছিল অন্ধকার। রোমের পতনের পর পশ্চিমা সভ্যতা এর অতীত ঐতিহ্যের ছায়া হয়ে রইল। ভবিষ্যতকে অতীতের চেয়ে ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। জ্ঞানের সন্ধানে মধ্যযুগের পণ্ডিতরা সমসাময়িকদের দিকে না তাকিয়ে এরিস্টটল ও নব্যপ্লেটোনীয় মতবাদের দিকে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রাচীন সময় থেকে দর্শন ও বিজ্ঞান আমদানি করার সাথে সাথে এরা অসীম ও শূন্যতার ভয়কেও আমদানি করে নিয়ে আসে।

মধ্যযুগের পণ্ডিতরা শূন্যতাকে বাজে জিনিস মনে করত। আবার বাজে জিনিসকেও মনে করত শূন্য। আক্ষরিক অর্থেই শয়তান ছিল শূন্য। বোদিয়াসের যুক্তি ছিল এ রকম: ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। এমন কিছুই নেই যা তিনি করতে পারেন না। কিন্তু পরম মহান ঈশ্বর কখনও মন্দ কাজ করতে পারেন না। অতএব, মন্দ হলো শূন্য। মধ্যযুগীয় মন একেই স্বাভাবিক বলে মেনেয় নেয়।

তবে মধ্যযুগীয় দর্শনের অন্তরালে একটি দ্বন্দ্ব লুকিয়ে ছিল। এরিস্টটলীয় মতবাদ ছিল গ্রিকধর্মী। কিন্তু সৃষ্টির ইহুদি-খ্রিষ্টান ধারণা ছিল সেমেটিক। আর সেমেটিকদের শূন্যতা নিয়ে তেমন ভয় ছিল না। সৃষ্টির সূচনাই হয়েছে একটি বিশৃঙ্খল শূন্যতা থেকে। চতুর্থ শতকের ধর্মতাত্ত্বিক সেন্ট অগাস্টিন এর একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁর মতে, সৃষ্টির আগের অবস্থায় শূন্য শূন্য ধরনের কিছু একটা ছিল। যা একদম মহা শূন্যতার চেয়ে খানিক বেশি। তবু শূন্যের ভীতি ছিল মারাত্মক রকমের। খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা তাই বাইবেলকে সংশোধন করে এরিস্টটলীয় মতবাদের সাথে মেলানোর চেষ্টা চালায়। অথচ করার কথা উল্টোটা।

তবে আশার কথা হলো, সব সভ্যতা শূন্যকে এত ভয় পায়নি।

তথ্যনির্দেশ

১। গ্রিক দার্শনিক জেনো তার নিজের ও পারমিনিডিসের কিছু মতবাদ প্রমাণের জন্যে বেশ কিছু প্যারাডক্স তৈরি করেন। মূলত তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, গতি বলতে কিছু নেই। সবই চোখের ভুল। প্যারাডক্সগুলোর মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত একটি হলো একিলিজ ও কচ্ছপ প্যারাডক্স। এমন বেশ কিছু প্যারাডক্স নিয়ে জানা যাবে অনুবাদকের *অসীম সমীকরণ* বইয়ে।

২। কথাটি বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট বা নববিধানের বুক অব জনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ। তবে মূল সংস্করণে *অনুপাত* শব্দের বদলে *শব্দ* বলা হয়েছে। তবে গ্রিক ভাষায় অনুপাতকে বলা হয় লোগোস। আবার *শব্দ* বোঝাতেও একই শব্দ বোঝানো হয়। যার ফলে প্রথাগত অনুবাদের চেয়ে *অনুপাত* বলাটাই বেশি ভাল অনুবাদ।

-লেখকের নোটের আলোকে অনুবাদক।

৩। পৃথিবীর রাতের আকাশে খালি চোখে শুধু পাঁচটি গ্রহই দেখা সম্ভব। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এ কারণেই প্রাচীনকালে মানুষ গ্রহ বলতে এই পাঁচটিকেই চিনত।

৪। সবচেয়ে সুন্দর সংখ্যা অবশ্যই একেজনের কাছে একেকটি। কারও কাছে পাই (৩.১৪১৬) সবচেয়ে সুন্দর। কারও কাছে (আমিসহ) আবার সুন্দর অয়লার সংখ্যা (২.৭১৮...)।

৫। কারণ অর্ধ-ইঞ্চিকে আদর্শ বানালে মোট দাগ হবে ২৪টি। তাহলে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চিতে পড়বে ১০+১ টি = ১১টি দাগ। বাকি অংশও এভাবে।

৬। মূলদ সংখ্যার ইংরেজি নাম rational number, যাকে আক্ষরিক বাংলা করলে হয় যৌক্তিক সংখ্যা।

৭। ১, ২, ৩, ... ইত্যাদি সংখ্যাগুলোর সেটকে বলা হয় স্বাভাবিক বা গণনা সংখ্যা।

৮। বিজ্ঞানকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব না অনস্তিত্ব কোনোটাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। অনেকে বাস্তবে যেটা করে সেটা হলো বিজ্ঞানকে সুকৌশলে নিজের যুক্তির জন্য কাজে লাগানো। বিজ্ঞান হলো প্রকৃতির একটি মডেল, যা দেখা ঘটনাকে ব্যাখ্যা ও পরবর্তী ঘটনার পূর্বাভাস দেয়। এই মডেল কখনোই পুরোপুরি সঠিক নয়। আইনস্টাইন না নিউটনের তত্ত্ব শতভাগ সঠিক নয়। বিজ্ঞানে ক্রমেই এক মডেলের বদলে অন্য আরও ভাল মডেল স্থান করে নেয়। এ জন্যেই জর্জ বক্স বলেছেন, “কোনো মডেলই সঠিক নয়, তবে কিছু মডেল কাজে আসে।“ যেমন কাজে নিউটন বা আইনস্টাইনের অনির্ভুল তত্ত্বগুলো।

৯। জেনো যেভাবে যেকোনো সসীম জিনিসকে অসীম বানিয়ে দিতেন। ধরুন বাস ধরতে হলে আপনাকে ১ মাইল হাঁটতে হবে। ১ মাইল যেতে হলে আগে ৫০০ মিটার যেতে হবে। ৫০০ মিটার যেতে হলে ২৫০ মিটার তো আগে যেতে হবে। সেজন্যে আবার ১২৫ মিটার। এভাবে চিন্তা করলে অসীম সংখ্যক দুরত্ব পাড়ি দিতে হবে। যা আসলে একটি কৃত্রিম অসীম। কারণ সবগুলো দূরত্ব যোগ করলে দাঁড়ায় ঐ এক (১) মাইলই।

১০। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যিশুকে (আ) ক্রুশবিদ্ধ করার পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হন। এ ঘটনার নামই ইস্টার।

১১। একটি পদ্ধতিতে ১ম বর্ষ নির্ধারণ করা হয়েছিল রোম শহরের প্রতিষ্ঠাকে ভিত্তি ধরে। আরেকটিতে সম্রাট ডায়োক্লিশানের সিংহাসনে আরোহণকে ভিত্তি ধরা হয়। খ্রিষ্টানদের কাছে তাদের নবীর জন্ম একটি শহর প্রতিষ্ঠার চেয়ে গুরুতপূর্ণ। যে শহরকে আবার ভ্যান্দাল ও গথরা কয়েকবার লুণ্ঠন করেছে। আবার কোনো সম্রাটের শাসনকালের সূচনা নিয়েও তাদের কোনো উৎসাহ ছিল না। যার আবার ছিল এক দূর্ভাগ্যজনক শখ: খ্রিষ্টানদের ভোজের জন্য সে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাণীদেরকে বন্দী করে ধরে রাখত।

১২। কম্পিউটার প্রোগ্রামাররা কোনো কাজ বারবার করার জন্য প্রোগ্রাম লিখলে শূন্য থেকে শুরু করেন। ধরা যাক কোনো কাজ দশ বার করা হবে। তাহলে শূন্য থেকে শুরু করে নয় পর্যন্ত। কোনো প্রোগ্রামার মনের ভুলে এক থেকে শুরু করে নয় পর্যন্ত যেতে পারে। ফলে দশ ধাপের বদলে কাজটি হবে নয় ধাপ। ১৯৯৮ সালে অ্যারিজোনায় এমন একটি ভুলই একটি লটারি ভণ্ডুল করে দেয়। বারবার তোলার পরেও নয় উঠছিল না। পরে এক মুখপাত্র বিব্রত বদনে স্বীকার করে, 'ভুলবশত নয় প্রোগ্রামে বাদ পড়েছিল।"

চতুর্থ অধ্যায়

শূন্যের অসীম ঈশ্বর   
শূন্যের ধর্মতত্ত্ব

নতুন দর্শন সন্দেহ তৈরি করেছে  
আগুন নিভে গেছে  
হারিয়ে গেছে সূর্য ও পৃথিবী   
কেউ জানে না খুঁজবে কোথায়  
সব ভেঙে চুরমার   
সব যোগান, সব সম্পর্ক   
রাজপুত্র, প্রজা, বাবা, ছেলে হয়েছে বিস্মৃত  
  
~ জন ডন, অ্যানাটমি অব দ্য ওয়ার্ল্ড   
  
রেনেসাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল শূন্য ও অসীম। ইউরোপ ধীরে ধীরে জেগে উঠল অন্ধকার যুগ থেকে। জেগে উঠল শূন্য ও অসীম। অন্য ভাষায় কিছুই না ও সবকিছু। গির্জার এরিস্টটলীয় ভিত্তি গুড়িয়ে গেল। পথ খুলল বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের।   
  
যাজকশ্রেণী বিপদটা প্রথমে বুঝতে পারেনি। বড় বড় যাজকরা শূন্য ও অসীমের ভয়ানক ধারণা নিয়ে পরীক্ষা চালায়। যদিও গির্জার পছন্দের এ ধারণাগুলো ছিল প্রাচীন গ্রিক দর্শনের মূলে কুঠারাঘাত। রেনেসাঁ যুগে আঁকা সব চিত্রকর্মের কেন্দ্রে থাকত শূন্য। আর বিশপ ঘোষণা করেছিলেন, মহাবিশ্ব অসীম। সীমানাবিহীন। কিন্তু শূন্য ও অসীমের প্রতি ভালবাসা স্থায়ী হতে পারল না।   
  
গির্জ হুমকির মুখে পড়লে ফিরে গেল সেই প্রাচীন গ্রিক দর্শনে। আবারও গ্রহণ করল বহু বছর ধরে সমর্থন দিয়ে আসা এরিস্টটলের মতবাদ। কিন্তু ততদিনে বড্ড দেরি। শূন্য ততক্ষণে পাশ্চাত্যে আসন গেঁড়ে বসেছে। গির্জার আপত্তি আর কেউ কানে নিল না। শূন্যকে ছাড়তে রাজী নয় বিজ্ঞানসমাজ।   
  
খোসা খুলল বাদামের  
হে ঈশ্বর, বাদামের খোসায় আবদ্ধ হয়ে আমি নিজেকে অসীম জগতের রাজা ভাবলে কি আমি খারাপ স্বপ্ন দেখেছি?   
--- উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, হ্যামলেট  
  
রেনেসাঁর শুরুতে বোঝা যায়নি শূন্য যে গির্জার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে৷ শূন্য ছিল নিছক একটি শৈল্পিক হাতিয়ার৷ একটি অসীম শূন্যতা, চিত্রশিল্পের মাধ্যমে যা প্রস্ফুটিত হতে থাকে৷   
  
পনের শ শতকের আগের চিত্রশিল্প ও অঙ্কন ছিল প্রাণহীন৷ ছবিগুলো ছিল বিকৃত, দ্বিমাত্রিক ও বিশাল আকারে৷ ছোট্ট ও বিশ্রী প্রাসাদ থেকে চ্যাপ্টা নাইটদের উঁকি মারতে দেখা যেত (চিত্র ১৭)। সেরা শিল্পীরাও বাস্তবধর্মী দৃশ্য আঁকতে পারতেন না৷ তারা শূন্যের শক্তির ব্যবহার জানতেন না।   
  
চিত্র ১৭: চ্যাপ্টা নাইট ও বিশ্রী প্রাসাদ  
  
ইতালীয় স্থাপত্যবিদ ফিলিপো ব্রুনেলেশি প্রথম অসীম শূন্যের ব্যবহার দেখান৷ ভ্যানিশিং পয়েন্ট বা মিলিয়ে যাওয়া বিন্দু ব্যবহার করে তিনিই প্রথম একটি বাস্তবভিত্তিক ছবি আঁকেন৷   
  
মাত্রার ধারণা থেকে আমরা জানি, একটি বিন্দু একটি শূন্য৷ দৈনন্দিন জীবনে আমরা ত্রিমাত্রিক বস্তু নিয়ে কাজ করি৷ আইন্সটাইন দেখান, জগতটা আসলে চতুর্মাত্রিক। এটা নিয়ে আমরা পরেও কথা বলব৷ আপনার দেয়াল ঘড়ি, কফির মগ কিংবা এ বইটি সবই ত্রিমাত্রিক জিনিস৷ এখন একটু কল্পনা করুন: একটি বিশাল হাত বইটিকে চাপা দিল। ত্রিমাত্রিকের বদলে বইটি এখন দ্বিমাত্রিক এক আয়ত৷ বইটির একটি মাত্রা হারিয়ে গেছে। এর এখন শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে৷ উচ্চতা নেই৷ এবার ধরুন সেই দৈত্যাকার হাত বইটিকে পাশ থেকে চাপা দিল৷ বইট এখন আর আয়তক্ষেত্রের মতো নেই৷ হয়ে গেছে লাইন৷ আরেকটি মাত্রা কম এখন। নেই প্রস্থ ও উচ্চতা৷ আছে শুধু দৈর্ঘ্য৷ এটা এখন একমাত্রিক বস্তু৷ এই মাত্রাটাকেও উধাও করে দেওয়া যাবে৷ লাইন বরাবর আবার চাপা দিলে লাইন হয়ে যাবে বিন্দু৷ এক অসীম শূন্যতা, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কিছুই নেই৷ বিন্দু আসলে শূন্যমাত্রিক বস্তু৷   
  
১৪২৫ সালে ব্রুনেলেশি বিখ্যাত ফ্লোরেন্টাইন ভবন ব্যাপটিস্টেরির একটি চিত্রের কেন্দ্রে এমন একটি বিন্দু বসান৷ মিলিয়ে গিয়ে বিন্দুতে পরিণত এ শূন্যমাত্রিক বস্ত ক্যানভাসের ওপর অতিশয় ক্ষুদ্র একটি ডট। এর মানে হলো পর্যবেক্ষক থেকে অসীম দূরের বস্তু (চিত্র ১৮)। চিত্রের দূরের দৃশ্যগুলো ক্রমেই এই বিন্দুর কাছাকাছি হয়৷ পর্যবেক্ষক থেকে দূরে গেলে হতে থাকে ছোট থেকে আরও ছোট৷ মানুষ, গাছ বা বিল্ডিং-- সবকিছুই যথেষ্ট দূরে গেলে হয়ে যায় শূন্যমাত্রিক বিন্দু। হারিয়ে যায় দৃষ্টির সীমানা থেকে৷ চিত্রের কেন্দ্রের শূন্য অসীম স্থানকে ধারণ করে৷   
  
আপাত বিরোধী এই বস্তুই ব্রুনেলেশির চিত্রকে জাদুর মতো পাল্টে দিল৷ চিত্রটা ব্যাপ্টিস্টেরি ত্রিমাত্রিক ভবনকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলল৷ আসল বস্তুর সাথে যেন পার্থক্যই নেই৷ মজার ব্যাপার হলো ব্রুনেলেশি আয়নায় ভবনটিকে দেখে চিত্রের সাথে তুলনা করেন৷ প্রতিফলিত ছবির সাথে আঁকা চিত্র হুবহু মিলে গিয়েছিল৷ এই ভ্যানিশিং পয়েন্ট বা মিলিয়ে যাওয়া বিন্দু দ্বিমাত্রিক অঙ্কনকে ত্রিমাত্রিক ভবনের নিখুঁত নকলে পরিণত করল।

চিত্র ১৮: মিলিয়ে যাওয়া বিন্দু

মিলিয়ে যাওয়া বিন্দুতে শূন্য আর অসীমের সম্পর্ক কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। শূন্য দিয়ে গুণ সংখ্যারেখাকে ছোট করে বিন্দু বানিয়ে দেয়। একইভাবে ভ্যানিশিং পয়েন্ট মহাবিশ্বের প্রায় পুরোটাকে একটি ডটের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে। এ বিন্দুর নাম সিংগুলারিটি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে পরবর্তীতে এ ধারণা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে ঐ সময়ে গণিতবিদরা শূন্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চিত্রশিল্পীদের চেয়ে বেশি কিছু জানতেন না। পনের শতকে তো আসলে চিত্রশিল্পীরাই ছিলেন সৌখিন গণিতবিদ। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি অঙ্কনের দৃষ্টিকোণ (perspective) নিয়ে একটি সহায়িকা লিখেছিলেন। চিত্রশিল্প নিয়ে তাঁর আরেক বইয়ে আছে এক সতর্কবাণী, “গণিতবিদ না হলে আমার লেখা পড়বে না।" এ গণিতবিদ-চিত্রশিল্পীরাই দৃষ্টিকোণ পদ্ধতিকে নিখুঁত করে তোলেন। অল্প দিনের মাথায় দেখা গেল, এরা যেকোনো বস্তুকে তিন মাত্রায় ফুটিয়ে তুলতে পারছেন। শিল্পীরা মুক্তি পেলেন সমতলের মতো চিত্রের হাত থেকে। শূন্য বদলে দিয়েছে শিল্পের জগতকে।।

আক্ষরিক অর্থেই শূন্য ব্রুনেলেশির চিত্রের কেন্দ্রে অবস্থান করছিল। গির্জাও শূন্য এবং অসীম নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখল। যদিও গির্জার মতবাদ তখনও এরিস্টটলের ওপর নির্ভরশীল। জার্মান কার্ডিনাল নিকোলাস অব কিউসা ব্রুনেলেশির সমসাময়িক মানুষ। তিনি অসীমের ধারণা দেখেই ঘোষণা করেন, “টেরা নন এস্ট সেন্ট্রা মুন্ডি।" । পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়। গির্জা তখনও বোঝেনি এ ধারণা কত বৈপ্লবিক হতে পারে।

মধ্যযুগীয় এরিস্টটলীয় মতবাদের একটি পুরনো ও শক্তিশালী কথা ছিল, “মহাবিশ্বের মধ্যে পৃথিবী অনন্য ও বিশেষ একটি জিনিস, যার মতো নেই আর কিছু।" এ কথাটাও ভ্যাকুয়ামের নিষেধাজ্ঞার মতোই শক্তিশালী ছিল। এ কথা অনুসারে, পৃথিবী আছে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থানের কারণে শুধু পৃথিবীতে প্রাণ ধারণের উপযোগী পরিবেশ আছে। এরিস্টটল মনে করতেন, সব বস্তু তাদের প্রকৃত অবস্থান খুঁজে পেতে চায়। পাথর বা মানুষের মতো ভারী জিনিসের স্থান ভূমি। বাতাসের মতো হালকার বস্তু থাকবে আকাশে। এ কথার ছিল নানান ফলাফল। এর অর্থ দড়ায়, গ্রহরা বায়ুর মতো হালকা জিনিস দিয়ে তৈরি। আরেকটি অর্থ হলো আকাশের মানুষ ভূমিতে পড়ে যাবে। ফলে বাদামের মতো মহাবিশ্বের খোলসের ভেতরের কেন্দ্রেই শুধু প্রাণীরা বাস করতে পারবে। অন্য গ্রহে প্রাণ থাকার ভাবনা এক গোলকের দুই কেন্দ্র থাকার মতোই হাস্যকর।

টেম্পিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর চাইলেই ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থান তৈরি করতে পারেন। টেম্পিয়ের জোর দিয়ে বললেন, ঈশ্বর এরিস্টটলের যেকোনো নিয়ম ভাঙতে পারেন। ঈশ্বর চাইলেই অন্য পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন। হাজার হাজার অন্য পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকতে পারে। সবগুলোতে থাকতে পারে প্রাণের অস্তিত্ব। এটা ঈশ্বরের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব। এরিস্টটল কী বললেন তাতে কিছু যায়-আসে না।

নিকোলাস অব কিউসা তো আরও এক ধাপ বেশি সাহসী। তিনি বললেন, ঈশ্বরে আসলে সেটাই করেছেন। তিনি বলেন, “অন্য তারার অঞ্চল আমাদের একইরকম। আমাদের বিশ্বাস, এদের কোনোটাই প্রাণ থেকে বঞ্চিত হয়নি।" আকাশে আছে অসীমসংখ্যক তারা। আকাশে জ্বলজ্বল করে গ্রহরা। চাঁদ ও সূর্য থেকে আসে আলো। আকাশের তারারা কেন আমাদের গ্রহ, চন্দ্র বা সূর্যের মতো হতে পারবে না? হয়তোবা তারা পৃথিবীকে উজ্জ্বল্ভাবে জ্বলতে দেখে, যেভাবে আমরা দেখি তাদেরকে।" নিকোলাস নিশ্চিত ছিলেন, ঈশ্বর আসলেই অসীমসংখ্যাক অন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী সরে গেল মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে। নিকোলাসকে তবুও ধর্মদ্রোহী বলা হয়নি। নতুন ভাবনার প্রতিও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি গির্জা।

এবার কাজে নামলেন আরেক নিকোলাস। তিনি নিকোলাসের দর্শনকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের রূপ দিলেন। নিকোলাস কোপার্নিকাস দেখালেন, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়। ঘুরছে বরং সূর্যকে কেন্দ্র করে।

সন্ন্যাসী ও চিকিৎসক কোপার্নিকাসের বাড়ি পোল্যান্ড। গণিত শিখেছিলেন জ্যোতিষবিদ্যার কাজ সহজ করার জন্য। যাতে করে তাঁর রোগীদের চিকিৎসা আরও ভাল করা যায়। ফলে কাজ করতে হলো গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে। আর তা করতে গিয়ে দেখলেন গ্রহদের গতিবিধির হিসাব রাখার গ্রিক নিয়ম অনেক অনেক জটিল। টলেমির ঘড়িসদৃশ আকাশ ছিল দারুণ নিখুঁত। যেখানে পৃথিবী ছিল কেন্দ্রে। তবে এ মডেল ছিল মারাত্মক জটিল। বছরজুড়ে গ্রহরা আকাশে চলাচল করে। তবে মাঝেমধ্যে থেমে যায়। চলতে থাকে পেছন দিকে।১ গ্রহদের এই অদ্ভুত আচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টলেমী নিয়ে আসেন মন্দবৃত্তের (epicycle) ধারণা। এরা হলো বৃত্তের পরিধির ওপরে কেন্দ্রবিশিষ্ট অন্য ছোট বৃত্ত। এদের মাধ্যমে গ্রহদের পেছনমুখী গতি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছিল (চিত্র ১৯)।

কোপার্নিকাসের ভাবনার শক্তিশালী দিক ছিল এর সরলতা। কেন্দ্রে পৃথিবী ও এর চারপাশে মন্দবৃত্তে পরিপূর্ণ মহাবিশ্বের বদলে তিনি সূর্যকেই কেন্দ্রে কল্পনা করলেন। যার চারপাশে গ্রহরা ঘোরে সরল বৃত্তপথে। কক্ষপথে পৃথিবী কোনো গ্রহকে পেছনে ফেললে সে গ্রহ পেছনে চলছে বলে মনে হবে। মন্দবৃত্তের কোনো দরকার নেই। কোপার্নিকাসের চিন্তা বাকস্তব উপাত্তের সাথে পুরোপুরি মেলেনি। কক্ষপথ আসলে বৃত্তাকার নয়। তবে সূর্যকেন্দ্রিক ধারণা ছিল সঠিক। টলেমির নমুনার চেয়ে তাঁর নমুনা ছিল অনেক সরল। পৃথিবী ঘোরে সূর্যের চারদিকে। *টেরা নন এস্ট সেন্ট্রা মুন্ডি*।

নিকোলাস অব কিউসা ও নিকোলাস কোপার্নিকাস এরিস্টটল ও টলেমির বাদামের খোসার মহাবিশ্বকে ভেঙে দিলেন। পৃথিবী সরে গেল মহাবিশ্বের কেন্দ্রের আরামদায়ক জায়গা থেকে। মহাবিশ্বকে ঘিরে নেই কোনো খোলস। মহাবিশ্ব বিস্তৃত অসীম অবধি। আছে অসংখ্যা বিক্ষিপ্ত জগত। সবগুলোতে হয়তো আছে রহস্যময় প্রাণী। কিন্তু অন্য সৌরজগতে প্রভাব রাখতে না পারলে রোম কীভাবে একমাত্র সঠিক গির্জার দাবিদার হবে? অন্য গ্রহে কি তবে অন্য পোপ আছে? ক্যাথলিক গির্জার জন্য অসুবিধাজনক এক অবস্থা। সে অসুবিধা আরও বড় হয়েছে নিজেদের ঘরের লোকদেরই চিন্তার পরিবর্তন শুরু হওয়ার কারণে।

১৫৪৩ সালে কোপার্নিকাস তাঁর সেরা কর্মটি প্রকাশ করেন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে। এর ঠিক পরপরই গির্জা নতুন চিন্তাগুলোকে দমন করা শুরু করে দিয়েছিল। নিজের *ডে রেভোউলশনিবাস* বইটা কোপার্নিকাস পোপ তৃতীয় পলের নামে উৎসর্গও করেছিলেন। তবে গির্জাও তখন আক্রান্ত। ফলে নতুন চিন্তা ও এরিরস্টটলকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা আর সহ্য করা হলো না।

গির্জার ওপর আক্রমণ তীব্র হয় ১৫১৭ সালে। কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত এক জার্মান সন্ন্যাসী উইটানবার্গের গির্জার দরজায় এক গুচ্ছ আপত্তির তালিকা সাঁটিয়ে দেন। (লুথার কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কোনো পণ্ডিত মনে করেন, তাঁর বিশ্বাসের ঘরে আলো জ্বলেছিল শৌচাগারে বসা অবস্থায়। এই তত্ত্ব বিষয়ে লেখা একটি বইয়ের মন্তব্য এরকম, “..............................।।/////” এভাবেই শুরু হয় সংস্কার-আন্দোলন। বুদ্ধিজীবিরা সকল দিকে পোপের কতৃত্বকে অস্বীকার করতে শুরু করলেন। ১৫৩০-এর দশকে সহজে সিংহাসনে বসে যাওয়া নিশ্চিত করতে অষ্টম হেনরি পোপের কতৃত্বকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন। নিজেকেই ঘোষণা করেন ইংল্যান্ডের প্রধান যাজক।

চিত্র ১৯: মন্দবৃত্ত, পেছনমুখী গতি ও সৌরকেন্দ্রিক নমুনা

ক্যাথলিক গির্জাও হানে পাল্টা আঘাত। কয়েক শতক ধরে নিজেরাও বিভিন্ন দর্শন নিয়ে পরীক্ষা-নিরিক্ষা চালাচ্ছিল ঠিকই, তবে নিজেদের মধ্যে মতভেদের হুমকি দেখা দিলে তারা পুনরায় অর্থডক্স বা প্রচলিত ধারায় ফিরে ফেল। গ্রহণ করে নিল প্রচলিত শিক্ষাকে। অগাস্টিন ও বোথিয়াসের মতো এরিস্টটলীয় দর্শনের পণ্ডিতদের দিকে ও এরিস্টটলের দেওয়া ঈশ্বরের প্রমাণের দিকে ঝুঁকে গেল। কার্ডিনাল ও যাজকদের জন্য প্রাচীন মতবাদ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ রাখা হলো না। শূন্য হলো ধর্মদ্রোহিতার নামান্তর। বাদামের খোসার মহাবিশ্বকে মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হলো। ভয়েড ও ইনফিনিটিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এসব শিক্ষা প্রচারের জন্য বেশ কিছু গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। ১৫৩০-এর দশকে সৃষ্ট এমন একটি অন্যতম গোষ্ঠীর নাম জেসুইট সম্প্রদায়। এ দলে ছিল সুপ্রশিক্ষিত একদল বুদ্ধিজীবি, যাদের কাজ প্রতিবাদী প্রোটেস্ট্যান্টদের আক্রমণ করা। ধর্মদ্রোহিতার সাথে লড়াই করার আরও অস্ত্রও ছিল গির্জা কাছে। স্প্যানিশ ইনকুইজিশন ১৫৪৩ সালে প্রোটেস্ট্যান্টদের পোড়ানো শুরু করে। যে বছর মারা গিয়েছিলেন কোপার্নিকাস। ঐ একই বছর পোপ তৃতীয় পল নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকা প্রকাশ করেন। গির্জার এই প্রতি-সংস্কারের লক্ষ্য ছিল নতুন চিন্তা দমন করে পুরনো মতবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বিশপ এঁটিয়ে টেম্পিয়ে ও কার্ডিনাল নিকোলাস অব কিউসা যে ধারণা তেরো শতকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, একই ধারণার জন্য ষোলো শতকে তাদের মৃত্যুদণ্ড হতে পারত।

হতভাগা জিওরডানো ব্রুনোর ক্ষেত্রে সেটাই ঘটল। ব্রুনো ছিলেন সাবেক ডমিনিকান যাজক। ১৫৮০-এর দশকে প্রকাশ করেন *অন্য দ্য ইনফাইনাইট ইউনিভার্স অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ডস* বই। এখানে তিনি নিকোলাস অব কিউসার মতো একই কথা বলেন। পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়। আমাদের মতো আছে আরও অসীম জগত। ১৬০০ সালে তাঁকে খুঁটির সাথে বেঁধে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। গ্যালিলেও গ্যালিলেই কোপার্নিকাস মতবাদের বিখ্যাত অনুসারী। ১৬১৬ সালে গির্জা তাঁকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। একই বছর কোপার্নিকাসের *ডে রেভোউলশনিবাস* নিষিদ্ধের খাতায় যুক্ত হয়। এরিস্টটলকে আক্রমণ করা মানে গির্জার ওপর আক্রমণ।

গির্জার প্রতি-সংস্কার নতুন দর্শনকে সহজে ধ্বংস করতে পারেনি। সময়ের সাথে সাথে এর শক্তি বাড়ল। এর পেছনে অবদান রেখেছেন কোপার্নিকাসের উত্তরসূরিরা। সতের শতকে এগিয়ে আসলে জ্যোতিষবিদ্য-সন্ন্যাসী জোহানেস কেপলার। কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে পরিশুদ্ধ করলেন তিনি। টলেমের নমুনার তুলনায় এটা আগের চেয়েও নিখুঁত হলো। পৃথিবীসহ বিভন্ন গ্রহ বৃত্তের বদলে উপবৃত্ত (ellipse) পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এর মাধ্যমে আকাশে গ্রহদের অবিশ্বাস্য রকম নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা গেল। সূর্যকেন্দ্রিক নমুনাকে ভূকেন্দ্রিক নমুনার চেয়ে খারাপ বলার আর সুযোগ থাকল না। কেপলারের নমুনা টলেমির নমুনার চেয়ে সরল। আর অনেক বেশি নিখুঁত। গির্জার আপত্তি পায়ে দলে কেপলারের সূর্যকেন্দ্রিক নমুনা টিকে গেল। কারণ কেপলার সঠিক, আর এরিস্টটল ভুল।

পুরনো মতবাদের ভুলগুলো ঠিক করার চেষ্টা গির্জা করল বটে! তবে ততদিনে এরিস্টটল, ভূকেন্দ্রিক নমুনা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কফিনে শেষ পেরেকটি মারা হয়ে গেছে। দার্শনিক যেসব কথা হাজার বছর ধরে বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছিলেন, তার সবগুলো নিয়ে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো হলো। এরিস্টটলীয় ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখা গেল না। আবার তাকে বাতিলও করা যাচ্ছে না। তাহলে কোনটা মেনে নিতে হবে? আক্ষরিকভাবে বললে, কিছুই না।

শূন্য এবং ভয়েড

এক অর্থে আমি ঈশ্বর ও শূন্যের মাঝামাঝি কিছু একটা।

- রেনে ডেকার্ট

ষোলো ও সতের শতকের দর্শন যুদ্ধের একদম কেন্দ্রে ছিল শূন্য ও অসীম (/////বইয়ে প্রথমবার ও মাঝেমাঝে ইনিফিনিটি বা অসীম এভাবে////। ভয়েড এরিস্টটলের দর্শনকে খোঁড়া করে দিয়েছিল। আর অসীম বড় মহাবিশ্বের ধারণা বাদামের খোসার মহাবিশ্বকে (/// nutshell universe////) ভেঙে চুরমার করে দেয়। পৃথিবী ঈশ্বরের সৃষ্টির কেন্দ্রে থাকতে পারে না। অনুসারীরা আর থাকল না গির্জার প্রভাবাধীন। ক্যাথলিক গির্জা এবার আগের চেয়ে তীব্র আকারে শূন্য ও ভয়েডকে অস্বীকার করতে চাইল। কিন্তু শূন্য তো আসন গেঁড়ে বসে গেছে। জেসুইট সম্প্রদায়ের মতো গির্জার প্রতি নিষ্ঠাবান বুদ্ধিজীবিরাও দোলাচলে পড়ে গেলেন। কেউ এরিস্টটলকে আঁকড়ে থাকলেন। কেউ আবার নতুন দর্শন মেনে নিলেন, যেখানে আছে শূন্য, ভয়েড ও অসীম।

রেনে ডেকার্টও জেসুইট হিসেবে প্রশিক্ষিত ছিলেন। তিনিও নতুন ও পুরনো মতবাদ নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি শূন্যকে প্রত্যাখ্যান করলেন, আবার রাখলেন নিজের কাজের কেন্দ্রবিন্দুতেও। ১৫৯৬ সালে ফ্রান্সের কেন্দ্রে তাঁর জন্ম। তিনি শূন্যকে নিয়ে এলেন সংখ্যারেখার মাঝে। অসীম ও ভয়েডের মাঝে ঈশ্বরের প্রমাণ খুঁজলেন তিনি। আবার এরিস্টটলকে পুরোপুরি ছাড়তে পারলেন না। ভয়েডের ভীতি ছিল তার মধ্যে প্রবল। সে ভয়ে তার অস্তিত্বই তিনি অস্বীকার করলেন।

পিথাগোরাসের মতো ডেকার্টও দার্শনিক-গণিতবিদ। তাঁর সবচেয়ে অমর কাজ সম্ভবত একটি গাণিতিক উদ্ভাবন। যাকে এখন আমরা বলি কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক। স্কুলে জ্যামিতি পড়া যে কেউ তা দেখেছে। বন্ধনীর ভেতরের এক গুচ্ছ সংখ্যা দিয়ে স্থানের ওপর বিন্দুর অবস্থান পাওয়া যায়। যেমন (৪,২) দিয়ে বোঝায় ৪ একক ডানে ও ২ একক উপরে। কিন্তু কার ডানে বা উপরে? এটাই মূলবিন্দু। শূন্য (চিত্র ২০)।

অক্ষরেখা ১ দিয়ে শুরু করা যাবে না--এটা ডেকার্ট বুঝলেন। তা করতে গেলে ভুল হয়ে যাবে। যে ভুল বিড করেছিলেন ক্যালেন্ডার ঠিক করতে গিয়ে। তবে বিডের সাথে ডেকার্টের পার্থক্য আছে। ডেকার্টের বাড়ি ইউরোপে। যেখানে আরবি সংখ্যার প্রচলন আছে। অতএব, তিনি শূন্য থেকে গণনা শুরু করলেন। স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার একদম কেন্দ্রে বসালেন শূন্যকে। যেখানে দুই অক্ষ একে অপরকে অতিক্রম করে গেছে। মূলবিন্দু (০,০) হলো কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি। (আমরা এখন যে চিহ্ন ব্যবহার করি, ডেকার্টের চিহ্ন তা থেকে একটু আলাদা ছিল। প্রথমত, তাঁর স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় ঋণাত্মক সংখ্যার ঠাঁই ছিল না। যদিও তাঁর সহকর্মী কদিন পরেই তাঁর হয়ে কাজটা করে দেন।

চিত্র ২০: কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক

নিজের স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার শক্তি বুঝতে ডেকার্ট মোটেই সময় নিলেন না। এর মাধ্যমে তিনি ছবি ও আকৃতিকে সমীকরণ ও সংখ্যায় পরিণত করলেন। কার্তেসীয় স্থানাঙ্কের মাধ্যমে বর্গ, ত্রিভুজ, তরঙ্গাকার রেখার মতো সব জ্যামিতিক বস্তুকে গাণিতিক সম্পর্কের সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব হলো। যেমন ধরুন, মূল বিন্দুতে কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত। একে প্রকাশ করা যাবে এক সেট বিন্দু দিয়ে, যাদের জন্য x^2 + y^2 – 1 = 0 সমীকরণটি সত্য। পরাবৃত্ত হতে পারে y – x^2 = 0। সংখ্যা ও আকৃতির মিলন ঘটালেন ডেকার্টে। পশ্চিমের জ্যামিতি শিল্প আর প্রাচ্যের বীজগণিত শিল্প আর আলাদা থাকল না। তারা একই হয়ে গেল। সব আকৃতিকেই f(x , y) = 0 আকারের সমীকরণ হিসেবে লেখা যায় (চিত্র ২১)। স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল শূন্য। আর যেকোনো জ্যামিতিক আকৃতিতে ভেতরে ভেতরে শূন্য লুকায়িত ছিল।

ডেকার্টের মন বলত, ঈশ্বরের সাম্রাজ্যেও শূন্য আছে ভেতরে ভেতরে। ঠিক যেমন আছে অসীম। ওদিকে এরিস্টটলীয় দেয়াল হেলে যাচ্ছিল। ডেকার্ট আবার জেসুইট সম্প্রদায়ের নিবেদিত সৈনিক। তাই তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পুরনো প্রমাণের বদলে শূন্য ও অসীম দিয়ে নতুন প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালালেন।

প্রাচীনকালের মানুষের মতো ডেকার্টও মনে করতেন শূন্য থেকে কোনো কিছু তৈরি করা যায় না। এমনকি জ্ঞানও না। এর অর্থ দাঁড়ায়, সকল চিন্তা-ভাবনা, সকল দর্শন, ভবিষ্যতের সব আবিষ্কার জন্মের সময় মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যেই থাকে। জ্ঞানার্জন মানে আসলে মহাবিশ্বের ক্রিয়াকৌশল সম্পর্কে আগে থেকে স্থাপিত সেই সূত্রগুলো বের করে আনা। ডেকার্টের মতে, আমাদের মনের মধ্যে অসীমরকম নিখুঁত এক সত্তার ধারণা আছে। অতএব, এই অতিশয় নিখুঁত সত্তা বা ঈশ্বর অবশ্যই আছেন। অন্য সবার মধ্যে তার তুলনায় কমতি আছে। তারা সসীম। অবস্থান শূন্য ও ঈশ্বরের মাঝামাঝি কোথাও। অসীম ও শূন্যের মিশ্রণ।

ডেকার্টের দর্শনে শূন্যের বারবার দেখা গেছে। তবে মৃত্যুর আগ পর্যন্তও তিনি মনে করতেন ভয়েড বা চূড়ান্ত শূন্যের অস্তিত্ব নেই। ডেকার্ট প্রতি-সংস্কার আন্দোলনের সময়ের সন্তান। ডেকার্ট এরিস্টটল সম্পর্কে জেনেছেন এমন এক সময়ে যখন গির্জা তার মূলনীতিগুলোর ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল ছিল। ফলে এরিস্টটলের মতবাদ ডেকার্টের মাথায় আসন গেঁড়ে নেয়। সে প্রভাবের স্বীকার হয়ে তিনি ভ্যাকুয়ামকে অস্বীকার করেন।

চিত্র ২১: একটি পরাবৃত্ত, বৃত্ত ও উপবৃত্তাকার রেখা

এ সময় আসলে কোনো একটি পক্ষ বেছে নেওয়া কঠিন ছিল। ভ্যাকুয়ামকে পুরোপুরি অস্বীকার করার অধিবিদ্যাগত সমস্যা ডেকার্টের অবশ্যই জানা ছিল। জীবনের শেষের দিকে তিনি পরমাণু ও ভ্যাকুয়াম সম্পর্কে লেখেন, “বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে এটা অব্যশ্যই বলা যায় যে এগুলো ঘটবে না। তবে কেউ এটাও অস্বীকার করতে পারবে না, এগুলো ঈশ্বরই করতে পারেন। যেমন, তিনি প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্তন করতে পারেন।" তবুও তাঁর আগের মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের ধারণাই লালন করতেন তিনি। বিশ্বাস করতেন, কোনো কিছুই সরলপথে চলতে পারে না। কারণ তাতে করে পেছনে ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থান তৈরি হবে। বরং মহাবিশ্বের সবকিছু চলে বৃত্তাকার পথে। এটা আসলে ছিল এরিস্টটলীয় চিন্তা। তবু যত কিছুই হোক, শেষ পর্যন্ত ভয়েড বা শূন্যতা কিছুদিনের মধ্যেই এরিস্টটলকে চিরতরে ডুবিয়ে দেয়।

আজকের দিনেও শিশুদের শেখানো হয়, “প্রকৃতি শূন্যস্থান অপছন্দ করে।" শিক্ষকরা হয়তো ঠিক জানেন না এ কথাটার উৎপত্তি কোথায়। এটা ছিল এরিস্টটলীয় দর্শনের সম্প্রসারিত একটি অংশ: শূন্যস্থানের অস্তিত্ব নেই। কেউ শূন্যস্থান তৈরি করতে চাইলে প্রকৃতি তা ঠেকানোর জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করবে। কথাটাকে ভুল প্রমাণ করেন গ্যালিলেওর সহকারি ইভানজেলিস্টা টরিসেলি। তিনিই প্রথম ভ্যাকুয়াম তৈরি করেন।

ইতালির শ্রমিকরা কুয়া ও খাল থেকে পানি তুলতে এক ধরনের পাম্প ব্যবহার করত, যা অনেকটা বড় সিরিঞ্জের মতো কাজ করত। পাম্পের মধ্যে ছিল একটি পিস্টন, যা একটি নলের ভেতরে আঁটোসাঁটো করে লাগানো থাকত। নলের নিচের মাথা পানিতে ডোবানো থাকত। পিস্টনকে উপরে তোলা হলে পানির স্তর নল বেয়ে উঠে আসত।

এক শ্রমিকের কাছে গ্যালিলেও জানতে পেরেছিলেন, এ পাম্পে একটি সমস্যা হচ্ছিল। এটি দিয়ে পানি ওঠানো যেত মাত্র ৩৩ ফুট। এরপরে উপরের চাপদণ্ড যতই উঠতে থাকুক, পানির স্তর একই থাকত। সমস্যাটা কৌতূহলের জন্ম দিল। গ্যালিলেও তাঁর সহকারি টরিসেলির কাছে পাঠিয়ে দেন সমস্যাটি। কাজ পেয়ে টরিসেলি পরীক্ষা-নিরিক্ষা শুরু করলেন। তাঁকে জানতেই হবে পাম্পের রহস্যময় সীমাবদ্ধতার রহস্য। ১৬৪৩ সালের কথা। টরিসেলি পরীক্ষা চলানোর জন্য লম্বা একটি নল নিলেন। এক মাথা বন্ধ করে পারদ দিয়ে ভর্তি করলেন একে। এবার উপুড় করে খোলা মাথা পারদ ভর্তি একটি পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। নলটাকে বায়ুর মধ্যে উপুড় করলে পারদ পড়ে গিয়ে বাতাস দিয়ে ভর্তি হত নল। ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থান তৈরি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু টরিসেলি তো তা না করে নলটিকে ডুবিয়েছেন পারদের মধ্যে। নলের পারদের জায়গা দখলে নেওয়ার জন্য বাতাসের আসার সুযোগ নেই। প্রকৃতি সত্যিই শূন্যস্থানকে অপছন্দ করলে নলের পারদ উপরেই ঝুলে থাকত। নিচে পড়ে গেলেই তো উপরে শূন্যস্থান তৈরি হবে। কিন্তু পারদ তা করেনি। নেমে গেল খানিকটা। উপরে থাকল ফাঁকা স্থান। এই স্থানে কী থাকল? কিছুই না। ইতিহাসে এই প্রথম কেউ শূন্যস্থান ধরে রাখতে পারলেন।

নল যত বড়-ছোট যাই হোক, পারদ নিচে নেমে যাচ্ছে। থেমে যাচ্ছে পাত্র থেকে প্রায় ৩৩ ইঞ্চি উপরে এসে। অন্যভাবে বললে, উপরের শূন্যস্থানের সাথে লড়াই করে পারদ ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত উপরে উঠতে পারে। প্রকৃতি সর্বোচ্চ ৩০ ইঞ্চির ভ্যাকুয়াম অপছন্দ করে। ব্যাপারটা ব্যখ্যা দিয়েছিলেন ডেকার্ট বিরোধী আরেক পণ্ডিত।

১৬২৩ সালে ডেকার্টের বয়স ২৭ বছর। ডেকার্টের ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী লেইজ প্যাসকেলর বয়স তখন শূন্য। প্যাসকেলের বাবা এঁটিয়ে ছিলেন গুণী বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ। তরুণও প্যাসকেলও ছিলেন বাবার মতোই মেধাবী। তরুণ বয়সে তিনি প্যাসকালিন নামে একটি যান্ত্রিক হিসাব যন্ত্র বানান। ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর আসার আগে প্রকৌশলীদের ব্যবহৃত কিছু ক্যালকুলেটরের সাথে এর মিল ছিল।

প্যাসকেলের বয়স ২৩ বছর থাকতে তার বাবা বরফখণ্ডের ওপর পিছলে পড়ে গিয়ে উরু ভাঙেন। একদল জ্যানসেনবাদী তার যত্ন নেন। ক্যাথোলিক এই গোষ্ঠীটি গড়ে ওঠেছিল মূলত জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ্পূর্ণ মনোভাব নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই প্যাসকেলের পুরো পরিবারের মন জয় করে নেয় তারা। প্যাসকেলও জেসুইট বিরোধী হয়ে গেলেন। প্রতি-প্রতি-সংস্কারবাদী। নতুন পাওয়া ধর্মটা প্যাসকেলের জন্য মানানসই ছিল না। এ গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশপ জ্যানসেন। তিনি ঘোষণা করেন বিজ্ঞানচর্চা পাপ। প্রাকৃতিক বিশ্বের প্রতি কৌতূহল এক ধরনের লালসা। ভাগ্য ভাল, প্যাসকেলের এ লালসা কিছু সময়ের জন্য হলেও তাঁর ধর্মীয় আবেগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। তিনি বিজ্ঞান দিয়েই ভ্যাকুয়ামের রহস্য আবিষ্কার করেন।

প্যাসকেলের ধর্মান্তরের সময় এঁটিয়ের এক বন্ধু তাদের বাড়িতে এলেন। পেশায় সামরিক প্রকৌশলী। তিনি টরিসেলির পরীক্ষা করে দেখালেন প্যাসকেলকে। প্যাসকেল তাতে মুগ্ধ। পানি, মদ ও অন্যান্য প্রবাহী পদার্থ নিয়ে নিজেই পরীক্ষা শুরু করলেন। এর ফলাফলই ১৬৪৭ সালে *নিউ এক্সপেরিমেন্টস কন্সার্নিং ভ্যাকুয়াম* (শূন্যস্থান সম্পর্কে নতুন পরীক্ষা) হিসেবে প্রকাশিত হয়। তবে এতেও মূল প্রশ্নটির উত্তর এল না। পারদ কেন ৩০ ইঞ্চি ওঠে আর পানি ৩৩ ফুট? সে সময়ের কিছু তত্ত্ব এরিস্টটলের দর্শনের কিছু অংশকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। বলা হয়, প্রকৃতির শূন্যুস্থান ভীতি সীমিত। শূন্যস্থানের নির্দিষ্ট কিছু অংশই কেবল নষ্ট করা যায়। তবে প্যাসকেলের ভাবনা ছিল আলাদা।

১৬৪৮ সালের শরৎকাল। প্যাসকেলের মাথায় হঠাৎ একটা ভাবনা এল। শালাকে পাঠিয়ে দিলেন পাহাড়ের ওপর। সাথে পারদ ভর্তি নল। পাহাড়ের চূড়ায় পারদ ৩০ ইঞ্চির চেয়ে অনেক কম উঠল (চিত্র ২২)। প্রকৃতি কি তবে সমতলের চেয়ে পাহাড়ে শূন্যস্থান দ্বারা কম প্রভাবিত হয়?

চিত্র ২২: প্যাসকেলের পরীক্ষা

প্যাসকেলের মতে, আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত এ আচরণ প্রমাণ করে, পারদের নল বেয়ে ওঠার কারণ ভ্যাকুয়ামভীতি নয়। আসল কারণ হলো বায়ুমণ্ডলের ওজন পাত্রের পারদেকে নিচের দিকে চাপ দিচ্ছে। আর তাতে পারদ ফাঁকা নল বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। পানি বা পারদ যাই হোক, বায়ুর চাপে তা খালি নল বেয়ে উঠে যাবে উপরে। ঠিক যেভাবে টুথপেস্টের নলের নিচে আলতো চাপ দিলে পেস্ট উপর দিয়ে বের হয়ে আসে। এখন, বায়ুর চাপ তো সীমিত। এ চাপ পারদকে চাপ দিয়ে ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত ওঠাতে পারে। পাহাড়ের চূড়ায় বায়ুর চাপ কম। তাই সেখানেও ৩০ ইঞ্চিও পারে না।

এখান একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে। শূন্যস্থান কিছুকে টেনে নেয় না। বরং বায়ুমণ্ডল চাপ দেয়। প্যাসকেলের এ সরল পরীক্ষা এরিস্টটলের বক্তব্যকে উড়িয়ে দিল। প্রকৃতি শূন্যস্থানকে ঘৃণা করে না। প্যাসকেল লেখেন, “এখন পর্যন্ত কেউ বলেনি, শূন্যস্থানের সাথে প্রকৃতির কোনো অনীহা নেই। প্রকৃতি শূন্যস্থানকে এড়িয়ে চলার কোনো চেষ্টা করে না। বরং শূন্যস্থানকে বিনা বাক্যে ও বিনা বাধায় মেনে নেয়।" এরিস্টটল পরাজিত হলেন। বিজ্ঞানীদের ভয়েডভীতি দূর হলো। শুরু করলেন ভয়েডের বিশ্লেষণ। নিষ্ঠাবান জ্যানসেনবাদী প্যাসকেল শূন্য এবং অসীমের মাঝেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজলেন। কাজটি করলেন এক ধরনের অবজ্ঞার মধ্য দিয়ে।

ঈশ্বর নিয়ে বাজি

প্রকৃতিতে মানুষ কী?অসীমের তুলনায় কিছুই না। শূন্যের তুলনায় সবকিছু। শূন্য ও সবকিছুর মাঝামাঝি কিছু একটা।

-- ব্লেইজ প্যাসকেল, পেনসিস।

প্যাসকেল একইসাথে বিজ্ঞানী ও গণততবিদ। বিজ্ঞানী হিসেবে করেছেন শূন্যস্থানের অনুসন্ধান। ভয়েডের বৈশিষ্ট্য। গণিতে অবদান রেখেছেন একেবারে নতুন একটু শাখা তৈরিতে। সে শাখার নাম সম্ভাবনা তত্ত্ব। সম্ভাবনা তত্ত্বকে শূন্য ও অসীমের সাথে মিলিয়ে তিনি পেলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

সম্ভাবনা তত্ত্ব তৈরি হয়েছিল অভিজাত ধনী লোকদের জুয়ায় বেশি লাভ করতে সহায়তার উদ্দেশ্যে। প্যাসকেলের তত্ত্ব ছিল দারুণ সফল। কিন্তু তাঁর গণিতচর্চা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৬৫৪ সালের ২৩ নভেম্বর। প্যাসকেলের মধ্যে তীব্র এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়। হয়তোবা এটা জ্যানসেনবাদীদের বিজ্ঞানবিরোধিতার প্রভাব। তবে কারণ যাই হোক, প্যাসকেলের নতুন আবেগ তাঁকে গণিত ও বিজ্ঞান থেকে পুরোপুরি দূরে সরিয়ে দিল। (চার বছর পরে একবার এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। সেসময় অসুস্থতার কারণে তাঁর ঘুমের সমস্যা হচ্ছিল। গণিতচর্চা শুরু করলে ব্যথা কমে যায়। প্যাসকেল মনে করতেন এর মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁকে বার্তা দিয়েছেন, তার জ্ঞানচর্চায় তিনি নাখোশ নন।) তিনি হয়ে গেলেন ধর্মতাত্ত্বিক। কিন্তু নিজের মূল পরিচয় ছাড়তে পারলেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়েওও বারবার তিনি বোকা ফরাসি জুয়াড়িদের কাছে ফিরে গেলেন। প্যাসকেল বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরকে বিশ্বাস করাই ভাল। কারণ আক্ষরিক অর্থেই বাজি ঈশ্বরের পক্ষে।

ঠিক জুয়ার প্রত্যাশিত লাভ হিসাব করার মতো করেই তিনি ঈশ্বরকে মেনে নেওয়ার হিসাব কষলেন। শূন্য ও অসীমের গণিতের মাধ্যমে তিনি সিদ্ধান্তে আসলেন, ঈশ্বর আছেন বলেই ধরে নেওয়া উচিত।

বাজির হিসাব দেখার আগে সহজ আরেকটি খেলা দেখে নেওয়া যাক। ধরুন ক ও খ নামে দুটি খাম আছে। আপনাকে খাম দেখানোর আগে কয়েন টস করে ঠিক করা হলো কোন খামে কত টাকা থাকবে। টসে হেড পড়লে ক খামে ১০০ টাকা থাকবে। আর টেল পড়লে টাকা থাকবে খ খামে। পরিমাণ ১০, ০০০,০০০। আপনি কোন খামটি নেবেন?

অবশ্যই খ। এতে আছে অনেক বেশি টাকা। সম্ভাবনার তত্ত্বের প্রত্যাশা (expectation) বলতে একটি হাতিয়ার আছে। যা দিয়ে আমরা বুঝতে পারব প্রতিটি খামের মান কত হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। ক খামে ১০০ টাকা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। তবে খামের একটা দাম আছে। তবে সেটা ১০০ পর্যন্ত নয়। কারণ আমরা নিশ্চিত করে জানি না, এতে টাকা আছে কিনা। গণিতবিদ খামের সম্ভাব্য পরিমাণগুলো যোগ করবেন। গুণ করবেন ঐ পরিমাণের সম্ভাবনা দিয়ে।

০ জেতার সম্ভাবনা ১/২ × ০ টাকা = ০ টাকা

১০০ টাকা জেতার সম্ভাবনা ১/২ × ১০০ টাকা = ৫০ টাকা

মোট প্রত্যাশা = ৫০ টাকা

ফলে ক খামের প্রত্যাশিত মান ৫০ টাকা।

একইভাবে খ খামের প্রত্যাশিত মান বের করা যাবে।

০ জেতার সম্ভাবনা ১/২ × ০ টাকা = ০ টাকা

১০,০০০,০০০ টাকা জেতার সম্ভাবনা ১/২ × ১০,০০০,০০০ টাকা = ৫,০০,০০০ টাকা

মোট প্রত্যাশা = ৫,০০,০০০ টাকা /// টেবিলে////

অতএব খ খামের প্রত্যাশিত মান ক খামের ১০,০০০ গুণ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দুই খামের মধ্যে বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকলে খ খাম নিতে হবে।

প্যাসকেলের বাজিও এই খেলার মতোই। পার্থক্য হলো এখানে দুই খামের বদলে আছে খৃষ্টান ও নাস্তিক। আসলে প্যাসকেল শুধু খৃষ্টান মত নিয়ে হিসাব করেছিলেন। তবে যুক্তির সম্প্রসারণে নাস্তিকের বিশ্বাসও চলে আসে।) যুক্তির খাতিরে আপাতত ধরে নিন, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা ৫০-৫০। (প্যাসকেল অবশ্য ঈশ্বর বলতে খৃষ্টানদের ঈশ্বরকেই বুঝিয়েছেন) এখন, খৃষ্টীয় খাম নেওয়া নিষ্ঠাবান খৃষ্টান হওয়ার পথ বেছে নেওয়া। এ পথ বেছে নিলে দুটো সম্ভাবনা থাকে। ধরুন, একজন মানুষ অনুগত খৃষ্টান হয়ে জীবনধারণ করল। পরে দেখা গেল ঈশ্বর বলতে কেউ নেই। তাহলে মানুষটা মৃত্যুর সাথে সাথে শূন্যতার গহীনে হারিয়ে যাবে। কিন্তু ঈশ্বর থেকে থাকলে সে স্বর্গে যাবে। ভোগ করবে অনন্তকালীন সুখ: অসীম। তাহলে খৃষ্টানের জন্য প্রত্যাশিত মান হবে:

শূন্যতায় হারানোর সম্ভাবনা ১/২ × ০ = ০

স্বর্গে যাওয়ার সম্ভাবনা ১/২ × অসীম (∞) = ∞

প্রত্যাশিত মান = ∞

আর যাই হোক, অসীমের (∞) অর্ধেক তো অসীমই (∞)। অতএব, খৃষ্টান হওয়ার লাভ অসীম। এখন, নাস্তিক হলে কী হবে? নাস্তিক সঠিক হলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। মত সত্য বলে প্রমাণিত হলেও তাতে কোনো লাভ নেই। ঈশ্বর নেই মানে স্বর্গও নেই। কিন্তু মত ভুল প্রমাণ হলে এবং গ ঈশ্বর থেকে থাকলে সে অনন্তকাল নরকে থাকবে (ঋণাত্মক অসীম)। অতএব নাস্তিকের জন্য প্রত্যাশিত মান হবে:

শূন্যতায় হারানোর সম্ভাবনা ১/২ × ০ = ০

নরকে যাওয়ার সম্ভাবনা ১/২ × অসীম (-∞) = -∞

প্রত্যাশিত মান = -∞

মানে ঋণাত্মক অসীম। এর চেয়ে খারাপ কিছু হতেই পারে না। প্যাসকেলের যুক্তিতে, একজন জ্ঞানী মানুষ নাস্তিক না হয়ে অবশ্যই খৃষ্টান হবে।

তবে এখানে আমরা ধরে নিয়েছি, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা ৫০-৫০। সম্ভাবনা যদি ১/১০০০ হয় তাহলে? সেক্ষেত্রে খৃষ্ঠান হওয়ার মান হবে:

শূন্যতায় হারানোর সম্ভাবনা ৯৯৯/১০০০ × ০ = ০

স্বর্গে যাওয়ার সম্ভাবনা ১/১০০০ × অসীম (∞) = ∞

প্রত্যাশিত মান = ∞

মান একই আছে। অসীম। আর নাস্তিকের প্রত্যাশিত মানও এখনও ঋণাত্মক অসীম। এক্ষেত্রে খৃষ্টান হয়ে থাকা এখনও অনেক বেশি সুবিধাজনক। সম্ভাবনা ১/১০,০০০ কিংবা ১/১০,০০০,০০০ বা আরও অনেক ছোট কোনো সংখ্যা হলেও একই ফল বের হবে। একমাত্র ব্যতিক্রম শূন্য।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা শূন্য হলে প্যাসকেলের বাজি অর্থহীন। খৃষ্টান হওয়ার প্রত্যাশিত মান হবে ০ × ∞ = ০। যা এক অর্থহীন কথা। অন্যথায় শূন্য ও অসীমের জাদুতে ঈশ্বরে বিশ্বাস করাই অপেক্ষাকৃত ভাল সিদ্ধান্ত। প্যাসকেল জানতেন বাজিতে জিততে কী করা লাগবে। যদিও তা করতে গিয়ে গণিত ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তথ্যনির্দেশ

১। গ্রহদের চলাচলের ব্যতিক্রমী আচরণের ব্যাখ্যা জানতে পড়ুন লেখকের বই *মহাবিশ্বের সীমানা (পৃষ্ঠা নং)।*

পঞ্চম অধ্যায়

অসীম শূন্য

শূন্য এবং বৈজ্ঞানিক বিপ্লব

গণিত সাধারণত নীতিতে অনড় থাকে। কিন্তু অসীম পরিমাণ বড় অপ ছোট জিনিসের আগমন গণিতকে নীতিতে আপোষ করতে অভ্যস্ত করল। গাণিতক বিষয়সমূহের পরম ///বৈধতা/// ও অখণ্ডনীয় প্রমাণের আদিম অবস্থা চিরতরে বিদায় নিল।বিতর্কের যুগের উদ্বোধন হলো। আমরা সে বিন্দুতে পৌঁছে গেলাম, যেখানে মানুষ অন্তরীকরণ ও যোগজীকরণ করে বুঝে-শুনে নয়, বরং বিশ্বাসের জায়গা থেকে। কারণ, এখন পর্যন্ত এর ফলাফল সঠক এসেছে।

-- ফ্রিদরিখ এংগেলস।

শূন্য এবং অসীম এরিস্টটলীয় দর্শনকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। শূন্যতা ও অসীমতা বাদামের খোসার মহাবিশ্বকে ধারণা বাতিল করে দিয়েছিল। বাতিল করে চিয়েছিল প্রকৃতির শূন্যস্থানকে অপছন্দ করার ধারণা। প্রাচীন জ্ঞান হয়ে গেল মূল্যহীন। বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির ক্রিয়াকৌশল বিষয়ক সূত্র তৈরি করছিলেন। তবে এ বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের মধ্যেও একটি অসুবিধা থেকে গেল: শূন্য। বিজ্ঞান জগতের তক্ষণ নতুন শক্তিশালী হাতিয়ার ক্যালকুলাস। কিন্তু এর গভীরে লুকিয়ে থাকল একটি প্যারাডক্স১। ক্যালকুলাসের উদ্ভাবক আইজ্যাক নিউটন ও গটফ্রিড উইলহেলম লিবনিজ///চেক বানান ও উচ্চারণ///। শূন্য দিয়ে ভাগ আর অসীমসংখ্য শূন্যকে যোগ করে তারা বানিয়ে ফেলেন গণিতের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। দুটো কাজই অবৈধ। এ যেন ১ + ১ = ৩ লেখা। মৌলিকভাবে ক্যালকুলাস গাণিতিক যুক্তি মেনে চলেনি। একে গ্রহণ করতে হলে নিতে হয় বিশ্বাসের আশ্রয়। বিজ্ঞানীরা তা করলেন। কারণ ক্যালকুলাস হলো প্রকৃতির ভাষা। এ ভাষাটা ভাল করে বুঝতে হলে অসীম শূন্যকে জয় করা চাই।

ইউরোপ ঘুমিয়ে কাঁটাল এক হাজার বছর। খৃষ্টীয় ফাদাররা দারুণ দক্ষতায় সে ঘুমের খাইয়ে দিয়েছিল। ইউরোপীয়রা সে ঘুম থেকে জেগে উঠল শূন্যকে সাথে নিয়ে।

-- টোবিয়াস ড্যান্টসিগ, নাম্বার: দ্য ল্যাংগুয়েজ অব সায়েন্স

শূন্যের অভিশাপ গণিতকে দুই হাজার বছর তাড়ীয়ে বেড়িয়েছিল। মনে হচ্ছিল অ্যাকিলিজকে আজীবন কচ্ছপের পেছনে ছুটতে হবে। ধরতে পারবে না কখনোই। জেনোর সরল ধাঁধাঁর মধ্যে লুকিয়ে ছিল অসীম। অ্যাকিলিজের অসীম ধাপ গ্রিকদের হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। তারা অসীম পদক্ষেপকে যোগ করার কথা ভাবেনি কভুও। যদিও অ্যাকিলিজের পদক্ষেপ ক্রমেই ছোট হয়ে শূন্যের দিকে এগোচ্ছিল। শূন্যের ধারণা ছাড়া আসলে এ যোগ করার সাধ্য তাদের ছিল না। তবে পশ্চিম শূন্যকে গ্রহণ করে নিলে গণিতবিদরা অসীমকে করায়ত্ত্ব করলেন। শেষ হলো অ্যাকিলিজের রেস।

জেনোর ধারায় অসীম অংশ আছে, সত্য। তবুও আমরা সবগুলো পদক্ষেপ যোগ করতে পারি। এরপরেও পাব সসীম মান। ১ + ১/২ + ১/৪ + ১/৮ + ... = ২। এ কৌশল প্রথম খাটান ব্রিটিশ যুক্তিবিদ রিচার্ড সুইসেথ। অসীম পদকে যোগ করে সসীম মান বের করেন তিনি। তিনি সংখ্যার একটি অসীম ধারা নেন। ১/২, ২/৪, ৩/৮, ৪/১৬, ..., n/2^n,…। এবার এদেরকে যোগ। পাওয়া যাচ্ছে দুই। দেখাই যাচ্ছে, ধারার সংখ্যাগুলো ক্রমেই শূন্যের কাছাকাছি হচ্ছে। কেউ হয়ত বলে ফলবেন, এ কারণই তো সসীম মান আসার জন্য যথেষ্ট। হায়! অসীম যদি এত সরল হত!

প্রায় একই সময়ের কথা। ফরাসি গণিতবিদ নিকোল ওরেম কাজ করছিলেন আরেকটি অসীম সংখ্যার ধারা নিয়ে। গালভরা নাম তরঙ্গ ধারা।

১/২ + ১/৩ + ১/৪ + ১/৫ + ১/৬ + ... জেনো এবং সুইসেথের ধারার মতোই পদগুলো শূন্যের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু সুইসেথ এদেরকে যোগ করতে গিয়ে দেখেন, যোগফল ক্রমেই বড় থেকে আরও বড় হচ্ছে। প্রত্যেকটা পদ আলাদাভাবে শূন্যের দিকে গেলেও যোগফল যাচ্ছে অসীমের দিকে। পদগুলোকে গুচ্ছে গুচ্ছে রেখে ওরেম এটা দেখান। ১/২ + (১/৩ + ১/৪) + (১/৫ + ১/৬ + ১/৭ + ১/৮) + ...। প্রথম গুচ্ছের মান ১/২। পরের গুচ্ছ (১/৪ + ১/৪) বা ১/২-এর চেয়ে বড়। (কারণ তিন ভাগের এক ভাগ চার ভাগের এক ভায়ের চেয়ে বেশি) একইভাবে পরের গুচ্ছ (১/৮ + ১/৮ + ১/৮ + ১/৮) বা ১/২-এর চেয়ে বড়। এভাবেই চলছে। ক্রমেই ১/২ করে যোগ হচ্ছেই। যোগফলও বড় হচ্ছে। যাচ্ছে অসীমের দিকে। পদগুলো শূন্যের দিকে গেলেও তা যথেষ্ট দ্রুত হারে হচ্ছে না। তার মানে, সংখ্যারা নিজেরা শূন্যের দিকে গেলেও অসীম সংখ্যার যোগফল অসীম হতে পারে। তবুও অসীম যোগফলের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক কিন্তু এটা নয়। শূন্য নিজেও অসীমের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নয়।

এই ধারাটার কথা ভাবুন:

১ - ১ + ১ – ১ + ১ - ১ + ১ – ১ + ১ - ...

এর যোগফল শূন্য দেখানো কঠিন কিছু নয়। কত সহজ কাজ:

(১ – ১) + (১ – ১) + (১ – ১) + (১ – ১) + (১ – ১) + ... = ০ + ০ + ০ + ০ + ০ + ...

অতএব শূন্য। কিন্তু অন্যভাবে দেখুন।

১ + (-১ + ১) + (-১ + ১) + (-১ + ১) + (-১ + ১) + (-১ + ১) + …

একে লেখা যায়

১ + ০ + ০ + ০ + ০ + ০ + …

যার মান ১। শূন্যের অসীম যোগফল একইসাথে ০ ও ১ হতে পারে। ইতালীয় পুরোহিত গুইডো গ্রান্ডি তো এই ধারা দিয়ে প্রমাণ করেন ঈশ্বর শূন্য (০) থেকে মহাবিশ্ব (১) সৃষ্টি করতে পারেন। আসলে এই ধারাকে যেকোনো কিছুর সমান প্রমাণ করা যায়। তা করতে হলে ১ ও (-১) এর বদলে ৫ ও (-৫) দিয়ে শুরু করুন (অথবা মূল ধারা থেকেই ৫টি ১ বের করে নিয়ে বাকিদেরকে (১ - ১) + (১ – ১) + ... এভাবে লিখুন।

অসীমসংখ্যক জিনিসকে নিজেদের সাথে যোগ করলে অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ফলাফল পাওয়া যায়। কখনো সংখ্যারা শূন্যের দিকে যোগফল হয় নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা। ২ বা ৫৩-এর মতো নাদুসনুদুস কোনো সংখ্যা। কখনো আবার যোগফল ধেয়ে চলে অসীমের দিকে। শূন্যের অসীম যোগফল আবার যেকোনো কিছুর সমান হতে পারে। কী অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে চলছে! কেউ জানত না কীভাবে অসীমকে করায়ত্ত্ব করা যায়।

ভাগ্য ভাল যে গাণিতিক জগতের চেয়ে ভৌত জগতটাকে বেশি অর্থবহ লাগে। বাস্তব জগতে কাজ করলে আর অসীমসংখ্যক জিনিসকে যোগ করাটা কাজেও আসে। যেমন ধরুন পাত্রের আয়তন বের করতে গেলে কাজটা করা লাগতে পারে। ১৬১২ সাল ছিল এমন কাজের উপযুক্ত একটি সময়।

এখানেও নায়ক জোহানেস কেপলার। যিনি গ্রহদের উপবৃত্তাকার পথের প্রমাণ দিয়েছিলেন। ঐ বছরটিতে তিনি পাত্রের আয়তন নিয়ে মগ্ন থাকেন। তিনি খেয়াল করেছিলেন পাত্রের নির্মাতা ও ব্যবহারকারীরা কাজটা করে খুব কাঁচা হাতে। কেপলার তাদের সাহায্যে কাজে নেমে পড়লেন। মনে মনে তিনি পাত্রকে অসীমসংখ্যক অসীম পরিমাণ ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করলেন। এরপর আবার তাদেরকে জোড়া দিয়ে পাত্রের আয়তন বের করলেন। পাত্রের পরিমাপের পেছনমুখী পদ্ধতি মনে হতে পারে একে। তবে ভাবনাটি ছিল চমৎকার।

সমস্যাটাকে সহজ করে বলা যাক। ত্রিমাত্রিক বস্তুর বদলে দুই মাত্রার একটি জিনিস কল্পনা করি। ধরুন একটি ত্রিভুজ। ২৩ নং চিত্রের ত্রিভজের উচ্চতা ও ভূমি ৮ একক করে। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেতে ভূমি ও উচ্চতা গুণ করে দুই দিয়ে ভাগ দিতে হয়। অতএব এ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ৩২ একক।

এবার ধরুন অন্যভাবে আমরা ক্ষেত্রফল বের করব। ত্রিভুজের ভেতরে অনেকগুলো আয়তক্ষেত্র বানিয়ে সেগুলোর ক্ষেত্রফল যোগ করব। প্রথম চেষ্টায় আমরা পাচ্ছি ১৬ একক (৪×৪)। যা মূল ক্ষেত্রফল থেকে অনেক কম। পরেরবার আরেকটু ভাল ফল এসেছে। এবার নিয়েছি তিনটি আয়ত। এবার পেলাম ২×২ + ২×৪ + ২×৬ = ২৪ একক। আগের চেয়েও ভাল হলেও মূল মান থেকে বেশ দূরে এখনও। তৃতীয় চেষ্টায় পাই ২৮। বোঝাই যাচ্ছে, আয়তক্ষেত্রকে ক্রমশ ছোট করতে থাকলে এদের মোট ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের খুব কাছাকাছি হয়। অনেক ছোট আয়তদের Δx চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। Δx ছোট হওয়া আমনে আসলে শূন্যের দিকে যাওয়া। (এ আয়তদের যোগফল হলো Σf(x), যেখানে গ্রিক বর্ণ Σ (সিগমা) হলো একটি উপযুক্ত পরিসরের যোগফল বা সমষ্টির প্রতীক। আর f(x) হলো আয়তক্ষেত্রগামী রেখার সমীকরণ। আধুনিক প্রতীকে Δx শূন্যের দিকে যেতে থাকলে Σ চিহ্নকে নতুন আরেকটি প্রতীক ∫ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আর ∫ এর সাথে dx বসিয়ে সমীকরণকে ∫f(x)dx লেখা হয়। এর নাম ইন্টিগ্র্যাল বা যোগজ।

চিত্র ২৩: ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পরিমাপ

কেপলারের এ কাজটার কথা বেশি মানুষ জানে না। তবে এ কাজটিই তিনি করেছিলেন তিন মাত্রায়। ব্যারেলের আয়তন পরিমাপ করতে গিয়ে। এর জন্য তিনি ব্যারেলকে কেটে বিভিন্ন তল বানান। পরে এদের আয়তন যোগ করে পান পাত্রের আয়তন। শূন্য নিয়ে একটা সমস্যা ছিল। তবে কেপলার সে সমস্যার চোখ রাঙানি করে কাজ চালিয়ে যান। Δx এর মান শূন্যের দিকে যেতে থাকলে অসীমসংখ্যক শূন্যকে যোগ করতে হয়। যার কোনো অর্থই নেই। কেপলার এ সমস্যা উপেক্ষা করেন। যুক্তির বিচারে অসীমসংখ্যক শূন্যকে যোগ করা অর্থহীন কাজ হলে কাজটার ফলাফল পাওয়া গেল যথাযথ।

বস্তুকে অসীম পরিমাণ ছোট করার মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানী কেপলার একাই নন। অসীম ও অসীম পরিমাণ ক্ষুদ্র এসব খণ্ডের কথা নিয়ে ভেবেছিলেন গ্যালিলেওও। এই দুটি ধারণা আমাদের সসীম জ্ঞানের পরিধির বাইরে। তিনি লেখেন, “প্রথমটি আমরা বুঝতে পারি না এর বিশালতার কারণে, আর পরেরটি এর তুচ্ছতার জন্য।" তবে অসীম শূন্য রহস্যময় হলেও গ্যালিলেও এর শক্তি অনুভব করতে পেরেছিলেন, "একবার ভাবুন দুটোকে একত্র করলে কী হতে পারে।" গ্যালিলেওর ছাত্র বোনাভেন্টুরা কাভালিয়েরি এর আংশিক উত্তর দিয়েছিলেন।

ব্যারেলের বদলে কাভালিয়েরি জ্যামিতিক বস্তু নিয়ে কাজ করেন। কাভালিয়েরির মতে ত্রিভুজের মতো সব ক্ষেত্রফলই অসীমসংখ্যক শূন্যদৈর্ঘ্যের রেখা দিয়ে গঠিত। আর আয়তন গঠিত অসীমসংখ্যক শূন্যউচ্চতার তল নিয়ে। এসব অবিভাজ্য রেখা ও তল ক্ষেত্রফল ও আয়তনের পরমাণুর মতো। এদেরকে আর ভাগ করা যাবে না। চিকন খণ্ড দিয়ে কেপলার ঠিক যেভাবে ব্যারেলের আয়তন মেপেছিলেন, কাভালিয়েরি সেভাবেই অসীমসংখ্যক অবিভাজ্য শূন্যকে যোগ করে জ্যামতিক বস্তুর ক্ষেত্রফল বা আয়তন বের করেন।

কাভালিয়েরির বক্তব্য জ্যামিতিকদের বিব্রত করে। শূন্য ক্ষেত্রফলের অসীমসংখ্যক রেখা যোগ করে দ্বিমাত্রিক ত্রিভুজ ছিলেন। একইভাবে অসীমসংখ্যক শূন আয়তনের তল যোগ করে ত্রিমাত্রিক কাঠামো পাওয়া যাবে না। সমস্যা আসলে একই জায়গায়: অসীম শূন্যের কোনো অর্থ নেই। তবে কাভালিয়েরির পদ্ধতি সবসময় সঠিক উত্তর দিচ্ছিল। অসীম শূন্যকে যোগ করার যুক্তিগত ও দার্শনিক সমস্যা গণিত্যবিদরা উপেক্ষা করেন। এর কারণও আছে। অসীম ক্ষুদ্র বা অবিভাজ্য ধারণার মাধ্যমে সমাধান মিলল দীর্ঘদিনের এক ধাঁধাঁর। এটা হলো স্পর্শকের সমস্যা। স্পর্শক হলো একটি রেখা, যা কোনো কার্ভকে শুধু স্পর্শ করে সোজা চলে যায়। মসৃণভাবে বেয়ে চলা একটি কার্ভের যেকোনো বিন্দুতেই এমন একটি রেখা থাকবে যা কার্ভকে আলতো করে স্পর্শ করে চলে যাবে। কার্ভকে স্পর্শ করবে একটিমাত্র বিন্দুতে। এটাই স্পর্শক। গণিতবিদরা দেখলেন, গতি নিয়ে কাজ করতে গেলে জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন, সুতোয় একটি বল বেঁধে আপনার মাথার চারপাশে ঘোরাচ্ছেন। বল ঘুরবে বৃত্তাকার পথে। হথাৎ সুতো ছিঁড়ে গেলে বল এক দিকে উড়ে চলে যাবে। আর এ গমন পথ হবে স্পর্শক রেখা বরাবর।বল নিক্ষেপের সময় বেসবল খেলোয়াড়ের বাহু বৃত্তচাপের পথ বেয়ে ঘোরে। বল ছেড়ে দেওয়া মাত্রই সেটা চলে স্পর্শক বরাবর (চিত্র ২৪)। আবার ধরুন পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়া বল কোথায় এসে থামবে জানতে হলে বের করতে হবে কোথায় স্পর্শক অনুভূমিকের সমান্তরাল। স্পর্শক রেখা কম-বেশি খাড়া হতে পারে। এ পরিমাপের নাম ঢাল। পদার্থবিদ্যায় আছে যার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ধরুন, একটি কার্ভ দিয়ে একটি বাইসাইকেলের অবস্থান প্রকাশ করা হলো। তাহলে স্পর্শক রেখার ঢাল বলে দেবে, কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করার সময় বাইসাইকেলের বেগ কত থাকবে।

চিত্র ২৪: স্পর্শক বরাবর গতি

এ কারণেই সতের শতকের বহু গণিতবিদ কোনো কার্ভের নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শক রেখার পরিমাপের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এ তালিকায় ইভানজেলিস্টা টরিসেলি, রেনে ডেকার্ট, ফরাসি ভদ্রলোক পিয়ের ডে ফের্মা (তাঁর শেষ উপপাদ্যের জন্য বিখ্যাত) আর ইংরেজ ভদ্রলোক আইস্যাক ব্যারো। তবে কাভালিয়েরির মতোই সবগুলোতেই অসীম ক্ষুদ্রের সমস্যা পাওয়া গেল।

কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শক আঁকতে হলে সবচেয়ে ভালো কাজ হলো অনুমান দিয়ে শুরু করা। এবার পাশেই আরেকটি বিন্দু নিয়ে দুটোকে যোগ করে দিন। যে রেখা পাওয়া যাবে সেটাই ঠিক স্পর্শক নয়। তবে কার্ভটা খুব বেশি উঁচি-নিচু না হলে রেখা দুটি খুব কাছাকাছি হবে (চিত্র ২৫)। বিন্দুগুলোর মধ্যে দূরত্ব কমাতে থাকলে অনুমান স্পর্শক রেখার খুব কাছাকাছি হতে থাকবে (চিত্র ২৫)। বিন্দুগুলো একে অপর থেকে শূন্য দূরত্বে থাকলে অনুমান হবে নিখুঁত। পাওয়া গেছে স্পর্শক। তবে ঝামেলা একটা আছে।

চিত্র ২৫: স্পর্শক রেখার অনুমান

একটি রেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এর ঢাল। ঢাল মাপার জন্য গণিতবিদরা দেখেন একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি রেখা কত উঁচুতে উঠল। যেমন ধরুন, একটি পাহাড়ে আপনি পূর্ব দিকে গাড়ি চালাচ্ছেন। প্রতি মাইল পূর্বে যেতে যেতে আপনি অর্ধমাইল মাইল উপরে উঠছেন। এমন পাহাড়ের ঢাল মাপা খুব সহজ। আপনি ভূমির সমান্তরালে যেতে এক মাইল গিয়ে উপরে উঠেছেন অর্ধেক মাইল। এই অর্ধেক মাইলই এই পাহাড়ের ঢাল। গণিতের ভাষায় ঢালের মান ১/২। একই কথা খাটে রেখার জন্যও। রেখার ঢাল মাপার জন্য দেখতে হবে নির্দিষ্ট অনুভূমিক দূরত্ব (Δx) পার হতে হতে কতটুকু ওপরে ওঠে (Δy)। রেখার ঢাল তাই হবে Δy/Δx।

স্পর্শক রেখার ঢাল হিসাব করতে গেলে কাছাকাছি মান বের করার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে দেয় শূন্য। স্পর্শক রেখার আসন্ন মান যত ভাল হতে থাকে, আসন্ন মান পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা বিন্দুগুলো তত কাছাকাছি হতে থাকে। তার মানে, বিন্দুগুলোর অনুভূমিক দূরত্বের পার্থক্যের (Δx) সাথে সাথে উচ্চতার পার্থক্যও (Δy) শূন্যের দিকে যেতে থাকে। স্পর্শকের আসন্ন মান নিখুঁত হতে থাকলে Δy/Δx এর মান ০/০-এর দিকে যেতে থাকে। শূন্য শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে মহাবিশ্বের যেকোনো সংখ্যা পাওয়া সম্ভব। স্পর্শক রেখার ঢালের কি কোনো অর্থ আছে?

অসীম বা শূন্য নিয়ে কাজ করতে গেলেই গণিতবিদরা যুক্তির গোলকধাঁধায় পড়ে যান। ব্যারেলের আয়তন বা পরাবৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করতে তারা অসীম শূন্যকে যোগ করেছেন। কার্ভের স্পর্শক বের করতে তারা শূন্যকে ভাগ দিয়েছেন শূন্য দিয়েই। স্পর্শক ও ক্ষেত্রফল বের করার মতো সরল কাজকে শূন্য ও অসীম স্ববিরোধী কাজের মতো করে ছাড়ল। ছোট সমস্যা মনে করে এদের কথা হয়তো সবাই ভুলেই যেত। কিন্ত মহাবিশ্বকে বুঝতে হলে যে অসীম ও শূন্যই মূল ভূমিকা পালন করে।

শূন্য ও মরমি ক্যালকুলাস

*পর্দা উঠিয়ে ভেতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখব শূন্যতা, অন্ধকার ও বিভ্রান্তি। ভুল না হয়ে থাকলে আমি বরং বলব পুরোপুরি অসম্ভব ও অসঙ্গতি। এরা না সসীম রাশি, আর না অসীম পরিমাণ ছোট, আর না শূন্যের সমান ছোট। আমরা কি এদেরকে মৃত রাশির ভূত বলতে পারি?*

-- বিশপ বার্কলি, দ্য অ্যানালিস্ট

স্পর্শক ও ক্ষেত্রফলের দুই সমস্যাই অসীম ও শূন্যের সাথে টক্কর লাগায়। এতে অবাক হওয়ার কিছুও নেই। দুই সমস্যা আসলে একই। দুটোই ক্যালকুলাসের জিনিস। ক্যালকুলাসের মতো এত শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। এই যেমন টেলিস্কোপ দিয়ে বিজ্ঞানীরা আগে অদেখা চাঁদ ও তারার জগত দেখতে সক্ষম হন। কিন্তু ক্যালকুলাসের কাজটা অন্য মাত্রার। এর মাধ্যমে মহাজাগতিক বস্তুর গতি নির্ণায়ক সূত্রগুলোকে প্রকাশ করা গেল। যে সূত্রই শেষ পর্যন্ত বলে দেয়, চাঁদ ও তারা তৈরি হয়েছিল কীভাবে। ক্যালকুলাস হয়ে গেল প্রকৃতিরই ভাষা। কিন্তু এরই পড়তে পরতে আবার মিশে আছে অসীম ও শূন্য। যা নতুন এই হাতিয়ারের জন্য হুমকিস্বরূপ।

ক্যালকুলাসের প্রথম উদ্ভাবক জন্মের পর প্রথম নিঃশ্বাসের আগেই অল্পের জন্য মারা যাচ্ছিলেন। ১৬৪২ সালের বড়দিনের দিন স্বাভাবিক সময়ের আগেই জন্ম হয়। ছোট্ট এক শরীর মুচড়ে পৃথিবীর আলো দেখেন আইজ্যাক নিউটন। আকারে এত ছোট ছিলেন যে এক লিটারের একটি মগেই তার জায়গা হয়ে যেত। বাবা ছিলেন কৃষক। মারা যান নিউটনের জন্মের দুই মাস আগেই।

ছেলেবেলাটা কাটিয়েছেন অস্থিরতার২ মধ্য দিয়ে। মা চেয়েছিলেন নিউটনও কৃষক হোক। ১৬৬০-এর দশকে ক্যামব্রিজে ভর্তি হন। ভাল করেন পড়াশোনায়। কয়েক বছরের মধ্যেই স্পর্শক সমস্যা সমাধানের একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি বের করেন। যেকোনো মসৃণ কার্ভের যেকোনো বিন্দুর স্পর্শক বের করতে পারতেন তিনি। এ কাজটা ক্যালকুলাসের অর্ধেক। নাম অন্তরীকরণ বা ব্যবকলন (differentiation)। তবে আমরা আজ ব্যাবকলন যেভাবে লিখি, নিউটনের পদ্ধতি তা থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল।

নিউটন ব্যাবকলন লিখতেন ফ্লুক্সোন বা গাণিতিক রাশিমালার প্রবাহ দিয়ে। তিনি অবশ্য এদের বলতেন ফ্লুয়েন্ট। নিউটনের ফ্লুক্সোনের একটি উদাহরণ এমন:

y=x2+x+1

এ সমীকরণে ফ্লুয়েন্ট হলো y ও x। নিউটন ধরে নেন, সময়ের সাথে y ও x এর মধ্যে পরিবর্তন বা প্রবাহ ঘটছে। এদের পরিবর্তনের হার বা ফ্লুক্সোনকে যথাক্রমে ẏ ও ẋ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ব্যাবকলন করতে নিউটন প্রতীক নিয়ে একটুখানি চাতুরী করেছেন। তিনি ফ্লুক্সোনদের পরিবর্তিত হতে দিয়েছেন। তবে সেটা অসীম ক্ষুদ্র হারে। তার মানে তিনি আসলে এদেরকে পরিবর্তন ঘটানোর বা প্রবাহিত হওয়ার জন্য কোনো সময়ই দেননি। নিউটনের প্রতীকে মুহূর্তের মধ্যে y হয়ে যাবে (y+Oẏ), যেভাবে x হয়ে যাবে (x+Oẋ)। (O অক্ষর দিয়ে প্রবাহিত সময়ের পরিমাণ বোঝানো হয়েছে। এটা বরাবর না হলেও প্রায় শূন্য। আমরা পরে আরও দেখব।) সমীকরণ তাহলে হয় এমন:

y+Oẏ = (x+Oẋ)2  + (x+Oẋ) + 1

(x+Oẋ)2 কে ভেঙে পাই:

y+Oẏ = x2+2x(Oẋ) + (Oẋ)2 + (x+Oẋ) + 1

পদগুলোকে সাজিয়ে পাই

y+Oẏ = (x2 + 2x +1) + 2x(Oẋ) + 1(Oẋ) + (Oẋ)2

এখন y = (x2 + 2x +1) হওয়ায় সমীকরণের উভয় পাশ থেকে এটাকে বাদ দেওয়া যায়। বাকি থাকে

Oẏ = 2x(Oẋ) + 1(Oẋ) + (Oẋ)2

আর এরপরেই আসে সেই বিশ্রী কৌশলটা। নিউটন বললেন Oẋ অনেক ছোট। (Oẋ)2 সে তুলনায় আরও অনেক অনেক ছোট। এটি রাশিমালা থেকে উধাও হয়ে যাবে। মূলত এটা শূন্য এবং উপেক্ষণীয়। তাহলে থাকে:

Oẏ = 2x(Oẋ) + 1(Oẋ)

তার মানে Oẏ/Oẋ = 2x +1, যা কার্ভটির যেকোনো বিন্দুতে স্পর্শক রেখার ঢাল (চিত্র ২৬)। অসীম ক্ষুদ্র সময়কাল O সমীকরণ থেকে ঝরে যায়। Oẏ/Oẋ হয়ে যায় ẏ/ẋ। O নিয়ে আর ভাবারই দরকার নেই।

এ কৌশলে মেলে সঠিক উত্তর। কিন্তু রাশি উধাও করে দেওয়ার ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর। নিউটনের কথা অনুসারে (Oẋ)2, (Oẋ)3, Oẋ এর উচ্চঘাতগুলো শূন্য হলে Oẋ নিজেও শূন্য হবে৩। অন্যদিকে, Oẋ শূন্য হলে শেষের দিকে আমরা যে Oẋ দিয়ে ভাগ দিয়েছি সেটা আসলে শূন্য দিয়ে ভাগ দেওয়ার নামান্তর। একই কথা খাতে একদম শেষ ধাপের ক্ষেত্রে। এখানেও Oẏ/Oẋ ভগাংশের হর ও লব থেকে O-কে বাদ দেওয়ার জন্য আমরা শূন্য দিয়ে ভাগ দিয়েছি। শূন্য দিয়ে ভাগ দেওয়া গাণিতিক যুক্তিতে নিষিদ্ধ কাজ।

চিত্র ২৬: y=x2+x+1 পরাবৃত্তের কোনো বিন্দুতে ঢাল বের করতে হলে 2x +1 ব্যবহার করতে হবে।

নিউটনের ফ্লুক্সোন পদ্ধতি ছিল খুবই সন্দেহজনক। এটা করতে গিয়ে করা হয়েছে একটি অবৈধ গাণিতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এর ছিল বিশাল এক সুবিধা। এ পদ্ধতি বাস্তবে কার্যকর। ফ্লুক্সোন পদ্ধতি সমাধান করেছে স্পর্শকের সমস্যা। সমাধান করেছে ক্ষেত্রফলের সমস্যাও। কোনো কার্ভ বা রেখা দ্বারা আবদ্ধ অংশের ক্ষেত্রফল বের করতে হলে করতে হবে ব্যাবকলনের বিপরীত কাজ। যাকে আমরা বলি যোগজীকরণ। y=x2+x+1 কে ব্যাবকলন করলে স্পর্শকের ঢাল 2x +1 পাওয়া যায়। তেমনি 2x +1 কে যোগজীকরণ করলে কার্ভ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র পাওয়া যায়। এ সূত্র হলো y=x2+x+1। দুটি সীমা x = a এবং x = b এর মধ্যে কার্ভটির ক্ষেত্রফল হবে (b2 + b +1) – (a2 + a+1) (চিত্র ২৭)। (সঠিক করে বললে সূত্রটা আসলে y = x2 + x + c), যেখানে c একটি ইচ্ছামূলক ধ্রুবক। ব্যাবকলনের মাধ্যমে তথ্য হারিয়ে যায়। আর তাই যোগজীকরণ একদম নিখুঁত ফল দিতে পারে না। তা পেতে হলে দুটি সীমার (a, b) মান দিয়ে দিতে হবে।)

ক্যালকুলাস হলো দুটি উপকরণের সমাবেশ। যোগজীকরণ ও অন্তরীকরণ। হ্যাঁ, শূন্য ও অসীম নিয়ে খেলতে গিয়ে নিউটন গণিতের কিছু নিয়ম ভেঙেছেন। কিন্তু ক্যালকুলাস ছিল মারাত্মক শক্তিশালী। কোনো গণিতবিদ একে উপেক্ষা করতে পারলেন না।

প্রকৃতি কথা বলে সমীকরণ দিয়ে। অদ্ভুত এক কাকতালীয় ব্যাপার। গণিতের নিয়ম তৈরি হয়েছিল ভেড়া গুনতে আর জমির পরিমাপ করতে গিয়ে। আবার এই নিয়মগুলো দিয়েই চলে মহাবিশ্বের কাজ। প্রাকৃতিক সূত্রের প্রকাশ পায় গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে। আর সমীকরণ এক অর্থে একটি যন্ত্র। যাতে একটি সংখ্যা দিলে আরেকটি সংখ্যা পাওয়া যাবে। প্রাচীনকালেও মানুষ সমীকরণের কিছু নিয়ম জানত। যেমন লিভার বা চাপযন্ত্রের সূত্র। তবে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা হলে একের পর সূত্রের আবির্ভাব হতে থাকল। কেপলারের তৃতীয় সূত্রের কথাই ধরুন। এ থেকে জানা যায়, গ্রহরা কক্ষপথে পুরো ঘুরে আসতে কত সময় লাগবে। এ সময়টা হলো r3/t2 = k, যেখানে t হলো সময়, দূরত্ব r এবং k একটি ধ্রুবক। ১৬৬২ সালে রবার্ট বয়েল দেখান, আবদ্ধ পাত্রের গ্যাসে বাইরে থেকে চাপ দিলে ভেতরে চাপ বাড়বে। মজার ব্যাপার হলো চাপ p ও আয়তন v-এর গুণফল সবসময় ধ্রুব থাকে। pv = k যেখানে k ধ্রুবক। ১৬৭৬ সাল। রবার্ট হুক দেখেন স্প্রিংয়ের বল f পাওয়া যায় ঋণাত্মক ধ্রুবক (-k) কে দূরত্ব x দিয়ে গুণ করে। মানে f = -kx, যেখানে x হলো স্প্রিংকে টেনে যতটা বড় করা হলো। প্রথমদিকের এই সমীকরণ-সূত্রগুলো সরল সম্পর্ক খুব দারুণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিল। কিন্তু সমীকরণের আছে সীমাবদ্ধতা। এদের অপরিবর্তনীয়তাই এদের সার্বজনীন সূত্র হওয়ার পথে বাধা।

চিত্র ২৭: 2x+1 রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মান পেতে x2 + x + 1 ব্যবহার করতে হবে।

উদাহরণ হিসেবে স্কুলে পড়া একটা বিখ্যাত সমীকরণ দেখা যাক। এটা থেকে দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট বেগ v নিয়ে চললে t সময় পরে কত দূর (x) পৌঁছতে পারবেন। সে দূরত্বটা হলো x = vt। প্রতি ঘণ্টায় অতিক্রান্ত দূরত্বকে সময় দিয়ে গুণ করলেই পাওয়া যাবে দূরত্ব। এক শহর থেকে আরেক শহরে নির্দিষ্ট বেগে যেতে কত সময় লাগবে তা বের করতে এ সমীকরণ দারুণ কার্যকর। যেমন ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগে চললে ৬০ মাইল যেতে সময় লাগবে ৩০ মিনিট। কিন্তু বাস্তবে কয়টা জিনিস নির্দিষ্ট বেগে চলে? উপর থেকে একটি বল এর বেগ ক্রমেই বাড়বে। এক্ষেত্রে x = vt সূত্র একদম ভুল। (স্থিরাবস্থা থেকে) পতিত বলের ক্ষেত্রে সূত্র হবে x = gt2/2, যেখানে g হলো মহাকর্ষীয় ত্বরণ। বার বলের ওপর ক্রমেই বেশি বল (এবং সে কারণে ত্বরণ, মানে বেগের বৃদ্ধি) প্রয়োগ করলে x হবে t3/3 এর মতো কিছু। বেগকে সময় দিয়ে গুণ করে দূরত্ব পাওয়া সার্বজনীন কোনো সূত্র নয়। সকল ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা চলে না।

নিউটন ক্যালকুলাস দিয়ে এ সূত্রগুলোকে জোড়া দিয়ে এক গুচ্ছ সূত্র বানালেন, যেগুলো সকল অবস্থায় ও ক্ষেত্রে কাজ করে। এই প্রথমা বিজ্ঞান সাক্ষাৎ পেল সার্বজনীন সূত্রের। যে সূত্র ছোট ছোট আংশিক সূত্রগুলোর পেছনে থেকে কলকাঠি নাড়ায়। শূন্য ও অসীমের কারণে গণিতবিদরা জানতেন, ক্যালকুলাসের গভীরে লুকিয়ে আছে ত্রুটি। তবুও তাঁরা সহজেই নতুন এই হাতিয়ার লুফে নিলেন। সত্য কথা হলো, প্রকৃতি সাধারণ সমীকরণের ভাষায় নয়, কথা বলে অন্তরকীয় সমীকরণের ভাষায়। আর অন্তরকীয় সমীকরণ উপস্থাপন ও সমাধানের হাতিয়ারই হলো ক্যালকুলাস।

অন্তরকীয় সমীকরণ আমাদের চেনাজানা আর দশটা সমীকরণের মতো নয়। সাধারণ সমীকরণ হলো যন্ত্রের মতো। এতে একটি সংখ্যা দিলে ফিরিয়ে দেয় আরেকটি সংখ্যা। অন্তরকীয় সমীকরণও যন্ত্রের মতোই। তবে এক্ষেত্রে যন্ত্রের মধ্যে দেওয়া হয় সংখ্যার বদলে সমীকরণ। আর যন্ত্র ফিরিয়ে দেয় আরেকটি সমীকরণ। সমস্যার অবস্থার বিবরণ দেওয়া সমীকরণ দিলে (যেমন বল ধ্রুব বেগে চলছে কিনা বা বলের ওপর কোনো ফোর্স বা বল প্রযুক্ত হলো কিনা) পাওয়া যাবে কাঙ্ক্ষিত উত্তরের সমীকরণ (বল সরলরেখা বা পরাবৃত্ত পথে চলছে)। একটিমাত্র অন্তরকীয় সমীকরণ অগণিতসংখ্যক সমীকরণ-সূত্র নিয়ন্ত্রণ করে। আবার অন্য সমীকরণ-সূত্রের মতো এরা কখনও সত্য আবার কখনও মিথ্যা নয়। এরা সর্বদাই সত্য। সার্বজনীন সূত্র। এ যেন প্রকৃতির কলকব্জা পর্যবেক্ষণ।

নিউটনের ফ্লুক্সোন পদ্ধতির ক্যালকুলাস কাজটা করল অবস্থান, বেগ ও ত্বরণের মতো জিনিসগুলোকে জোড়া দিয়ে। তিনি অবস্থানকে x চলক দিয়ে প্রকাশ করেই তিনি বুঝলেন বেগ আসলে ফ্লুক্সোন ছাড়া কিছুই নয়। এই ফ্লুক্সোনকেই আধুনিক গণিতে x এর ডেরিভেটিভ বা অন্তরক (ẋ) বলে। আর ত্বরণ (ẍ) বেগের (ẋ) অন্তরক ছাড়া আর কিছুই নয়। অবস্থান থেকে বেগ ও সেখান থেকে ত্বরণে যাওয়া আর আবার উল্টো দিকে ফিরে আসার জন্য অন্তরীকরণ (ডট বাড়ানো) ও যোগজীকরণ (ডট কমানো) করে যেতে হবে। এই চিহ্ন দিয়েই নিউটন একটিমাত্র সরল অন্তরকীয় সমীকরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সব বস্তুর গতি প্রকাশ করে ফেলেন। সমীকরণটা হলো F = mẍ, যেখানে F হলো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল আর m সে বস্তুর ভর। (অবশ্য এটা সে অর্থে সার্বজনীন কোনো সূত্র নয়। বস্তুর ভর ধ্রুব থাকলেই কেবল এটা সত্য। নিউটনের সূত্র আরও সাধারণ সংস্করণ হলো F = ṗ, যেখানে p হলো বস্তুর ভরবেগ (momentum) পরে আইনস্টাইন নিউটনের সূত্রে আরও পরিমার্জন করেন।) আপনার কাছে কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বলের সমীকরণ থাকলে অন্তরকীয় সমীকরণ বলবে সে বস্তুটা ঠিক কীভাবে চলাচল করবে। যেমন মুক্তভাবে পড়ন্ত বল পরাবৃত্ত পথে চলবে। আবার ঘর্ষণহীন স্প্রিং এদিক-ওদিক দোল খাবে চিরকাল। আর ঘর্ষণ থাকলে স্প্রিং ধীরে ধীরে স্থির হয়ে যাবে (চিত্র ২৮)। এ ফলাফলগুলোকে আলাদা আলাদা মনে হলেও এরা একই অন্তরকীয় সমীকরণ মেনে কাজ করে।

আবার একইভাবে বস্তুটা কীভাবে চলছে তা জানলেই অন্তরকীয় সমীকরণ আপনাকে বলে দেবে কী ধরনের বল তাতে প্রয়োগ করা হয়েছে। বস্তুটা বল হোক আর গ্রহ হোক তাতে কোনো তফাৎ নেই। (নিউটনের সাফল্য ছিল মহাকর্ষ বলের সমীকরণ দিয়ে গ্রহদের কক্ষদের আকৃতি বের করা। মানুষ ধারণা করেছিল এই বল 1/r2 এর সমানুপাতিক হবে। পরে দেখা গেল, নিউটনের সমীকরণ থেকে উপবৃত্ত বেরিয়ে আসছে। এতে মানুষ নিউটনকে সঠিক বলে মেনে নিল।) ক্যালকুলাসের এত ক্ষমতা প্রদর্শনের পরেও মূল সমস্যা থেকেই গেল। নিউটনের কাজের ভিত্তিটা ছিল খুব নড়বড়ে। শূন্য দিয়ে ভাগ। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর কাজেরও একই সমস্যা ছিল।

চিত্র ২৮: একই অন্তরকীয় সমীকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন গতি

১৬৭৩ সাল। এক বিখ্যাত জার্মান আইনজীবী ও দার্শনিক লন্ডন সফরে যান। তাঁর নাম গটফ্রিড উইলহেল্ম লাইবনিৎস (লিবনিজ হিসেবে পরিচিত)। তিনি এবং নিউটন বিজ্ঞান জগতকে দুই পক্ষে বিভক্ত করে ফেলেন। তবে দুজনের কেউই ক্যালকুলাসের শূন্যের সমস্যা সমাধান করতে পারেননি।

লন্ডন ভ্রমণের সময় তেত্রিশ বছর বয়সী লিবনিজ নিউটনের অপ্রকাশিত কাজ দেখেছিলেন কি না তা কেউ জানে না। ১৬৭৩ থেকে ১৬৭৬ সালের মধ্যে লিবনিজ আবারও লন্ডন যান। এসময় তিনিও ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেন। তবে সেটার চেহারা-সুরত খানিক আলাদা।

পেছনে তাকালে মনে হয়, লিবনিজ স্বতন্ত্রভাবেই ক্যালকুলাসের নিজস্ব সংস্করণ বানিয়েছিলেন। যদিও ব্যাপারটা এখনও বিতর্কিত। ১৬৭০-এর দশকে দুজনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। ফলে কে কাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছেন তো বোঝা মুশকিল। দুই তত্ত্বেরই ফলাফল একই। তবে চিহ্ন ও দর্শন পুরোপুরি আলাদা।

নিউটন অসীম পরিমাণ ক্ষুদ্র রাশিকে অপছন্দই করতেন। ক্ষুদ্র যে o গুলো ছিল তাঁর ফ্লুক্সোন সমীকরণে। যারা কখনও শূন্য আবার কখনও অশূন্যের মতো আচরণ করত। এক অর্থে এ অতিশয় ক্ষুদ্র রাশিরা ছিল অসীম পরিমাণ ক্ষুদ্র। চিন্তনীয় যেকোনো ধনাত্মক সংখ্যার চেয়ে ছোট। তবুও কোনোভাবে শূন্যের চেয়ে বড়। সে সময়ের গণিতবিদদের কাছে এ এক অদ্ভুত ধারণা। নিউটন নিজেও তাঁর সমীকরণের এ অতিশয় ক্ষুদ্র রাশি নিয়ে বিব্রত। তিনি এ সমস্যাকে লুকিয়ে রাখারও চেষ্টা করেন। তাঁর হিসাবের মাঝখানেই শুধু এ ০ গুলো আসত। হিসাবের শেষ দিকে উধাও হয়ে যেতে অলৌকিকভাবে। ওদিকে লিবনিজ যেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের মধ্যেই আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছেন। নিউটন যেখানে লিখেছেন Oẋ, লিবনিজ সেখানে লিখেছেন dx, আর অর্থ x এর অতিশয় ক্ষুদ্র একটি অংশ। লিবনিজের হিসাব-নিকাশের পুরো অংশেই এ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্ররা অপরিবর্তিতভাবে টিকে আছে। এবং x-এর সাপেক্ষে y-এর অন্তরক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাশি থেকে মুক্ত অনুপাত ফ্লুক্সোন ẏ/ẋ নয়। এটা বরং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুপাত dy/dx।

লিবনিজের ক্যালকুলাসের সাহায্যে এ dy ও dx নিয়ে ইচ্ছামতো কাজ করা যেত। অন্য সাধারণ সংখ্যার মতোই। এ কারণেই আধুনিক গণিত ও পদার্থবিদরা নিউটনের চিহ্নের বদলে লিবনিজের প্রতীক ব্যবহার করেন। লিবনিজের ক্যালকুলাসের ক্ষমতাও নিউটনের ক্যালকুলাসের মতো। তবে প্রতীকের সুবিধার কারণে বলা চলে, একটুখানি বেশি। এত কিছুর পরেও, গণিতের অভ্যন্তরে সমস্যা থেকেই গেল। লিবনিজের অন্তরকেও ০/০ দিয়ে ভাগের মতো নিষিদ্ধ কাজ আছে। যে নিউটনের ফ্লুক্সোনকে বিতর্কিত করেছিল। এ সমস্যা না কাটা পর্যন্ত ক্যালকুলাস যুক্তির ভিত্তির বদলে দাঁড়িয়ে থাকবে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর। (আসলে বাইনারি বা দ্বিমিক সংখ্যা আবিষ্কারের সময়ও লিবনিজের মনে বিশ্বাস দৃঢ়ই ছিল। যেকোনো সংখ্যাকে এক গুচ্ছ ০ ও ১ দিয়ে লেখা যায়। তাঁর কাছে এটাই ছিল বা creation ex nihilo (ক্রিয়েশিও এক্স নিহিলো) বা শূন্য থেকে সৃষ্টি। তাঁর মতে মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে ১ (ঈশ্বর) ও ০ (ভয়েড বা শূন্যতা) থেকে। লিবনিজ এমনকি চেষ্টা করেছিলেন জেসুইটরা যেন এই বিদ্যা কাজে লাগিয়ে চীনাদের খৃষ্টান বানায়।)

ক্যালকুলাসকে এই মরমি ভিত্তি থেকে মুক্ত করতে গণিতবিদদের বহু বছর লেগে যায়। কারণ তারা ব্যস্ত ছিলেন ক্যালকুলাসের আবিষ্কার নিয়ে বিতর্কে।

ভাবনাটা যে নিউটনের মাথায়ই প্রথম এসেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেটা ১৬৬০-এর দশকের কথা। তবে তিনি সে কাজ প্রকাশ করেননি ২০ বছর পর্যন্ত। নিউটন ছিলেন জাদুকর, ধর্মতাত্ত্বিক, আলকেমিস্ট ও বিজ্ঞানী (বাইবেলের লেখা থেকে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঈসার (আ) দ্বিতীয় আগমন হবে ১৯৪৮ সালে)। তবে তাঁর অনেক কথাই ছিল প্রচলিত ধর্মবিরোধী। এ কারণে তিনি নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন। অনিচ্ছুক ছিলেন গবেষণা প্রকাশের ব্যাপারে। ওদিকে নিউটনের চুপচাপ বসে থাকার মধ্যেই লিবনিজ নিজের মতো করে ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেন। কদিন না যেতেই একে অপরের বিরুদ্ধে নকলের অভিযোগ আনলেন। ইংরেজ গণিত সম্প্রদায় নিউটনকে সমর্থন দিলেন। মুখ ফিরিয়ে নিলেন লিবনিজপন্থী মহাদেশের অন্য গণিতবিদদের থেকে। এর ফলে ইংরেজরা নিউটনের ফ্লুক্সোনে ডুবে রইলেন। গ্রহণ করলেন না লিবনিজের উন্নত প্রতীক। ফলে আবেগের বশে মহাদেশের অন্য গণিতবিদদের চেয়ে পিছিয়ে গেলেন ক্যালকুলাসের চর্চা ও অগ্রগতিতে।

ক্যালকুলাসকে আচ্ছন্ন করে রাখা শূন্য ও অসীমের সমস্যার মোকাবেলায় ইংরেজ কেউ এগিয়ে এলেন না। এলেন এক ফরাসী। প্রথম ক্যালকুলাস পড়তে গেলেই গণিতবিদরা লোপিটালের নাম জানতে পারেন। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, যে নামে লোপিটালের নাম জড়িয়ে আছে, তা কিন্তু তাঁর আবিষ্কার নয়।

হোপিটালের জন্ম ১৬৬১ সালে। পুরো নাম গিয়ম ফ্রাসোয়া আতোঁয়া ডে লোপিটাল। অভিজাত ঘরের সন্তান লোপিটাল ছিলেন খুব ধনী। জীবনের শুরতেই গণিতের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিছুদিন সেনাবাহিনীতেও কাটিয়েছেন। ছিলেন অশ্বদলের ক্যাপ্টেন। তবে শীঘ্রই ফিরে আসেন তাঁর মূল ভালবাসা গণিতের কাছে। টাকা দিয়ে সবচেয়ে ভাল যে শিক্ষক পাওয়া যায় তাই বেছে নিয়েছেন লোপিটাল। তিনি জোহান বার্নুলি। সুইশ গণিতবিদ ও লিবনিজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্যালকুলাসের প্রাথমিক যুগের একজন বিশেষজ্ঞ। ১৬৯২ সালে বার্নুলি লোপিটালকে ক্যালকুলাস শেখান। নতুন এ গণিত লোপিটালকে মুগ্ধ করে। বার্নুলির নতুন গণিতের সব আবিষ্কার তাকে দেওয়ার ও ব্যবহার করার জন্য লোপিটাল বার্নুলিকে রাজি করান। বিনিময়ে দেন অর্থ। এর ফলাফল হিসেবে পাওয়া যায় একটি টেক্সট বই। ১৬৯৬ সালে লোপিটাল ক্যালকুলাস নিয়ে প্রথম টেক্সট বই লেখেন। নাম *Analyse des Infiniment Petits,* যার বাংলা অর্থ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের বিশ্লেষণ। এর মাধ্যমেই ইউরোপের বড় অংশ লিবনিজীয় ক্যালকুলাসের সাথে পরিচিত হয়। এ বইয়ে লোপিটাল ক্যালকুলাসের মৌলিক বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেই থেমে থাকেননি, উল্লেখ করেছেন নতুন দারুণ ফলাফলও। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতটার নাম লোপিটালস রুল বা লোপিটালের নিয়ম।

এ নিয়ম প্রথমেই আঘাত করে ক্যালকুলাসের সর্বত্র উদয় হওয়া ঝামেলাময় রাশি ০/০-কে। একটি গাণিতিক ফাংশনের মান কোনো বিন্দুতে ০/০-এর দিকে যেতে থাকলে তার প্রকৃত মান বের করার একটি উপায় বলে দেয় নিয়মটি। নিয়মটি বলে, এরকম ভগ্নাংশের মান পেতে হলে লবের অন্তরককে হরের অন্তরক দিয়ে ভাগ দিতে হবে।৪যেমন ধরুন x/sinx রাশিটি। মান x = 0 হলে লব শূন্য। আবার হরও শূন্য (sin0 = 0)। ফলে রাশিটির মান হয় ০/০। তবে হোপিটালের নিয়ম থেকে এর মান পাওয়া যায় 1/cosx। কারণ x এর অন্তরক 1 এবং sinx এর অন্তরক cosx। x = 0 হলে cosx এর মান হয় 1। অতএব, রাশিটি হয় ১/১ = ১। একটু বুদ্ধি খাটালেই হোপিটালের নিয়ম অন্য অদ্ভুত রাশিগুলোর মানও দিয়ে দেয়। এই যেমন ∞/∞, 00, 0∞ এবং ∞0। এ সবগুলো রাশি থেকেই (বিশেষভাবে ০/০) আপনার ইচ্ছামতো মান পেতে পারবেন। এটা নির্ভর করবে লব ও হরের ফাংশনের ওপর। এ কারণেই ০/০কে অনির্ণেয়। এটা আর পুরোপুরি রহস্যের চাদরে ঢাকা থাকল না। খুব সাবধানে ০/০-এর দিকে এগোলে গণিতবিদরা এর কিছু তথ্য জানতে সক্ষম হচ্ছেন। শূন্য আর এমন কোনো শত্রু নয়, যাকে এড়িয়ে চলতে হবে। এটা চর্চা করার মতো একটা ধাঁধাঁ।

১৭০৪ হোপিটাল মারা যান। বার্নুলি এবার বলতে শুরু করলেন, হোপিটাল তাঁর কাজ চুরি করেছেন। সে সময় গণিত সমাজ এ দাবি উড়িয়ে দেন। হোপিটাল নিজেকে সক্ষম গণিতবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ওদিকে বার্নুলির আবার তক্ষণ ভাবমূর্তি খুব খারাপ। এর আগে তিনি আরেক গণিতবিদের প্রমাণ নিজের বলে দাবি করেছিলেন (অন্য গণিতবিদ আর কেউ নন, ছিলেন তাঁরই ভাই জ্যাকব বার্নুলি।) তবে এক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর দাবির সত্যতা মেলে। হোপিটালের সাথে তাঁর যোগাযোগের ধরন থেকে তাঁর বক্তব্য প্রমাণিত হয়। তবে দূর্ভাগ্য তাঁর। ততদিনে হোপিটালের নাম নিয়মটার সাথে জড়িয়ে গেছে।

০/০ বিষয়ক বেশ কিছু সমস্যার সমাধানে হোপিটালের নিয়ম দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। তবে মূল সমস্যা থেকে গেল। নিউটন ও লিবনিজের ক্যালকুলাস শূন্য দিয়ে ভাগের ওপর নির্ভরশীল। নির্ভরশীল এমং সংখ্যারও ওপর, যাদেরকে বর্গ করলে উধাও হয়ে যায়। লোপিটালের নিয়ম ০/০ -এর ///সমস্যা নিয়ে কাজ করে এমন হাতিয়ার দিয়ে যা নিজেই ০/০ কে ঘিরেই তৈরি।///// এটা একটি বৃত্তাকার যুক্তি। একদিকে পুরো পৃথিবীর গণিত ও পদার্থবিদরা প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে ক্যালকুলাসের ব্যবহার শুরু করেছেন। অপরদিকে প্রতিবাদের ধ্বনি ধেয়ে আসল গির্জা থেকে।

১৭৩৪ সাল। নিউটনের মৃত্যুর বহু বছর পরের কথা। আইরিশ বিশপ জর্জ বার্কলি *দ্য অ্যানালিস্ট* নামে একটি বই লেখেন। বইটির অপর নাম *অ্যা ডিসকোর্স অ্যাড্রেসড টু অ্যান ইনফিডেল ম্যাথেম্যাটিশিয়ান*। (ইনফিডেল বা অবিশ্বাসী বলতে খুব সম্ভব এডমন্ড হ্যালিকে বোঝানো হয়েছিল, যিনি সবসময় ছিলেন নিউটনপন্থী।) *দ্য অ্যানালিস্ট* বইয়ে তিনি নিউটনের (ও লিবনিজের) শূন্য নিয়ে কুটকৌশলের তীব্র সমালোচনা করেন।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রকে তিনি আখ্যা দেন 'মৃত রাশির ভূত'। এছাড়া দেখান, এ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাশিগুলোকে এত সহজে মুক্তি দিলে অসঙ্গতি তৈরি হয়। এরপর কথার ইতি টানেন এভাবে, "আমি মনে করি, যে বা যারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফ্লুক্সোন বা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যবধান মেনে নিতে পারে, তার ঈশ্বরের ব্যাপারে কখনও সন্দেহ করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।"

সমসাময়িক গণিতবিদরা বার্কলির যুক্তির সমালোচনা করেন। তবে তাঁর যুক্তি ছিল পুরোপুরি সঠিক। ধরুন কেউ দেখাতে চান ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি। ইউক্লিডের কিছু সূত্র সাবধানে ধাপে ধাপে কাজে লাগিয়ে একজন গণিতবিদ সেটা সহজেই দেখাতে পারবেন। অন্য কোনো জ্যামিতিক সত্যও এভাবে প্রমাণ করা যাবে। কিন্তু ক্যালকুলাসের ব্যাপারটা উল্টো। এটা ছিল পুরোপুরি বিশ্বাস-নির্ভর।

বর্গ করলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাশিগুলো নেই হয়ে যায় কেন তার ব্যাখ্যা নেই কারও কাছে। সবাই এটা মেনে নিয়েছেন। কারণ একটাই: ঠিক সময়ে এদেরকে উধাও করে দিলে সঠিক উত্তর পাওয়া যায়। শূন্য দিয়ে ভাগ করা নিয়ে কারও আপত্তি নেই, কারণ সুবিধাজনকভাবে গণিতের নিয়ম উপেক্ষা করে পড়ন্ত আপেল থেকে আকাশে গ্রহদের কক্ষপথ-- সবকিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল। তবে উত্তর সঠিক হলেও ক্যালকুলাস ছিল ঈশ্বরকে মানার মতোই বিশ্বাস-নির্ভর কাজ।

মরমিবাদের ইতি

একটি রাশি হয় অশূন্য (কিছু একটা) হবে নাহয় শূন্য হবে। অশূন্য হওয়া মানে এটা এখনও টিকে আছে। শূন্য হলে এটা নেই হয়ে যাবে। এ দুটোর মাঝে কিছু থাকার দাবি উদ্ভট এক কল্পনা।

--জঁ বাটিস্ট ড্যালেমবেয়ার

ফরাসি বিপ্লবের তলে তলে ক্যালকুলাস থেকে মরমিবাদ বিদায় নিল। ভিত্তিটা নড়বড়ে হলেও আঠারো শতকের শেষ দিকে পুরো ইউরোপের গণিতবিদরা নতুন এ হাতিয়ার দিয়ে অসাধারণ সব সাফল্য পাচ্ছিলেন। মহাদেশের অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার সময়ের সেরা ব্রিটিশ গণিতবিদ সম্ভবত কলিন ম্যাকলরিন ও ব্রুক টেইলর। ক্যালকুলাস ব্যবহার করে তাঁরা বিভিন্ন ফাংশনকে সম্পুর্ণ নতুনভাবে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। যেমন গণিতবিদরা বুঝলেন, ক্যালকুলাসের কিছু কৌশল খাটিয়ে 1/(1-x) ফাংশনকে লেখা যায় এভাবে: 1 + x + x2 + x3 + x4 + …

দুই রাশিকে সম্পুর্ণ আলাদা মনে হলেও তারা পুরোপুরি একই (কিছু শর্ত সাপেক্ষে)।

শর্তগুলোর উৎপত্তি অসীম ও শূন্য থেকে। তবে শর্তগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অসীম ও শূন্যের মাধ্যমে এত সহজ রূপান্তর সুইশ গণিতবিদ লিওনহার্ট অয়লারকে ব্যাপারটা উৎসাহী করে তোলে। টেইলর ও ম্যাকলরিনের মতো একই যুক্তি দেখিয়ে তিনি 'প্রমাণ করেন'

...1/x3 + 1/x2 + 1/x + 1 + x2 + x3 + ...

ধারাটির এর সমষ্টি শূন্য। (নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, কিছু একটা ঝামেলা আছে। পরীক্ষা করে দেখতে x = 1 বসিয়ে দেখুন কী হয়।) গণিতবিদ হিসেবে অয়লার ছিলেন অসাধারণ। গণিত চর্চায় তাঁর সমকক্ষ কম লোকই আছেন। গণিতের সেরা প্রভাবশালীদের কাতারেও আছেন তিনি। তবে এক্ষেত্রে শূন্য ও অসীমকে অসাবধানে ব্যবহার করতে গিয়ে বিপথে যান তিনি।

ক্যালকুলাসের শূন্য ও অসীম শেষ পর্যন্ত বশীভূত হয় বেওয়ারিশ হিসেবে বেড়ে একটা এক শিশুর কাছে। মরমিবাদ আলাদা হয় গণিত থেকে। ১৭১৭ সালে ফ্রান্সের প্যারিসের জঁ বাটস্ট লে রঁ গির্জার সিঁড়িতে একটি শিশুকে খুঁজে পাওয়া যায়। শিশুর নাম রাখা হয় জঁ লে রঁ। শেষ পর্যন্ত তিনি ড্যালেমবেয়ার নাম গ্রহণ করেন। নিঃস্ব এক খেটে-খাওয়া দম্পতি তাঁকে লালন-পালন করেন। তারা পালক পিটা ছিলেন দরজা-জানালার কাচের কারিগর। পরে জানা গিয়েছিল, বাবা ছিলেন জেনারেল আর মাও অভিজাত এক মহিলা।

সাধারণ জ্ঞানের বিখ্যাত একটি বিশ্বকোষ রচনার জন্য তিই সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পান। সহলেখক ডেনি ডিডেরোর সাথে মিলে ২০ বছরে কাজটা করেছিলেন তিনি। তবে ড্যালেমবেয়ার নিছক বিশ্বকোষ লেখক ছিলেন না। ড্যালেমবেয়ারই বুঝতে পারেন, ভ্রমণ ও গন্তব্য দুটোই গুরত্বপূর্ণ। তিনিই গণিতের লিমিটের ধারণার প্রবর্তক। সমাধান করেন ক্যালকুলাসের লিমিটের সমস্যা।

আবার ফিরে যাই অ্যাকিলিজ ও কচ্ছপের গল্পে। যেখানে অ্যাকিলিজকে অসীম ধাপ পার হতে হয়। প্রতিটি ধাপের দৈর্ঘ্য ক্রমেই শূন্যের কাছে যায়। অসীম যোগফল নিয়ে কাজ করতে গিয়েই অসঙ্গতিপূর্ণ ফল পাচ্ছিলেন গণিতবিদরা। অ্যাকিলিজের সমস্যা, কার্ভ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বা গাণিতিক ফাংশনের বিকল্প রূপ--সবগুলোতেই একই সমস্যা।

ড্যালেমবেয়ার বুঝলেন, প্রতিযোগিতায় লিমিট বিবেচনা করলে অ্যাকিলিজের সমস্যা দূর হয়ে যায়। নং পৃষ্ঠার (নং ছবি) সমস্যায় আমরা দেখি, প্রতিটি ধাপে অ্যাকিলিজ ক্রমেই দুই ফুট লক্ষ্যের কাছাকাছি হচ্ছেন। কোনো ধাপই তাকে আগের চেয়ে পিছিয়ে দেয় না, বা রাখে না আগের জায়গায়ই। প্রতি মুহূর্তে সে যায় আরও সামনে। তার মানে প্রতিযোগিতার লিমিট বা চূড়ান্ত গন্তব্য হলো দুই ফুটের দাগ। ঠিক এখানেই অ্যাকিলজি কচ্ছপকে পার হয়ে যায়।

কিন্তু এই প্রতিযোগিতার লিমিট যে আসলেই দুই ফুট তা কীভাবে প্রমাণ করবেন? আমাকে চ্যালেঞ্জ করুন তাহলে। আমাকে একটি দূরত্ব বলুন। দূরত্বটা যত ক্ষুদ্রই হোক, আমি আপনাকে বলে দেব কখন অ্যাকিলিজ এবং কচ্ছপ দুজনেই লিমিট থেকে সেই ক্ষুদ্র দূরত্ব থেকেও কম দূরে আছে।

যেমন হয়ত আপনি আমাকে দেবেন এক ফুটের এক হাজার ভাগের এক ভাগ। কিছু হিসাব করে আমি বলে দেব, এগারতম ধাপ শেষে অ্যাকিলিজ থাকবে দুই ফুটের লক্ষ্যমাত্রা থেকে এক ফুটের দশ লক্ষ ভাগের ৯৯৭ অংশ দূরে। যেখানে কচ্ছপ থাকবে সে দূরত্বের অর্ধেক দূরে। আপনার চ্যালেঞ্জ আমি পূরণ করেছি। এক ফুটের দশ লক্ষ ভাগের ২৩ অংশ বেশিই পার হয়েছি। আপনি আমাকে এক ফুটের এক শ কোটি ভাগের এক ভাগ দূরত্ব দিলে কী হবে? ৩১ ধাপ শেষে অ্যাকিলিজ থাকবে লক্ষ্যমাত্রা থেকে এক ফুটের এক লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ দূরে। আর কচ্ছপ আগের মতোই সে দূরত্বের অর্ধেক দূরে। আপনি আমাকে যে চ্যালেঞ্জই দেন, সেটা আমি পূরণ করতে পারব। বলত পারব কত সময় পরে অ্যাকিলিজ দরকারের চেয়েও লক্ষ্যমাত্রার বেশি কাছে থাকবে। এতে বোঝা যায়, প্রতিযোগিতা এগোতে থাকলে অ্যাকিলিজ দুই ফুটের লক্ষ্যমাত্রার প্রতিযোগিতার লিমিট হলো দুই ফুট।

এখন এ প্রতিযোগিতাকে অসীম অংশের যোগফল না ভেবে সসীম অংশের লিমিট হিসেবে চিন্তা করুন। যেমন প্রথম প্রতিযোগিতায় অ্যাকিলিজ গেল এক ফুটের দাগ পর্যন্ত। তাহলে পথ শেষ হলো

১

পরের প্রতিযোগিতায় অ্যাকিলিজ গেল প্রথম দুই অংশ। প্রথমে এক ফুট ও পরে অর্ধেক ফুট। তাহলে পথ শেষ হলো

১ + ১/২

মোট ১.৫ ফুট। তৃতীয় প্রতিযোগিতায় যাবে ১ + ১/২ + ১/৪ মোট ১.৭৫ ফুট। প্রতিযোগিতার এ সবগুলো অংশই সসীম ও সুসংজ্ঞায়িত। অসীমের সাথে কখনও দেখা হয় না।

ড্যালেমবেয়ার

1 + ½ + ¼ + 1/8 + … + 1/2n + …

ধারাটাকে লিখলেন এভাবে:

limn→∞(1 + ½ + ¼ + 1/8 + … + 1/2n)

চিহ্নের খুব সামান্য পরিবর্তন। কিন্তু এতেই রয়েছে বিশাল ব্যবধান।

কোনো রাশিতে অসীম থাকলে বা শূন্য দিয়ে ভাগ থাকলে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মতো সরল গাণিতিক কাজসহ সবকিছু অকার্যকর হয়ে যায়। সবকিছু হয়ে পড়ে অর্থহীন। ফলে কোনো ধারায় অসীম পদ থাকলে যোগ চিহ্নটা (+) পর্যন্ত আর সরল-সোজা থাকে না। ঠিক এ কারণেই অধ্যায়ের শুরুতে দেখা ১-১+১-১+... এর যোগফল একইসাথে ০ ও ১।

তবে ধারার শুরুতে লিমিট চিহ্ন দিয়ে প্রক্রিয়াটাকে লক্ষ্য থেকে আলাদা করা হয়। এভাবে এড়ানো যায় অসীম ও শূন্য। অ্যাকিলিজের প্রতিযোগিতার অংশগুলো যেমন সসীম, এখানেও প্রত্যেকটি আংশিক যোগফল সসীম। আপনি যোগ করতে পারেন, ভাগ করতে পারেন, বর্গ করতে পারেন। যা ইচ্ছা। গণিতের নিয়ম তখনও খাতে। কারণ সবকিছু সসীম। এ কাজগুলো শেষ হলে নেবেন লিমিট। বের করতে পারবেন রাশিটির গন্তব্য। কখনও আবার লিমিটের অস্তিত্ব থাকে না। ১-১+১-১+... ধারার লিমিট নেই। আংশিক যোগফলগুলো ১ ও ০-এর মাঝে দোল খেতে থাকে। নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যের দিকে যাচ্ছে না। তবে অ্যাকিলিজের প্রতিযোগিতায় যোগফল এমন: ১ থেকে ১.৫, ১.৭৫, ১.৮৭৫, ১.৯৩৭৫ ইত্যাদি। ক্রমেই কাছাকাছি হচ্ছে ২-এর। যোগফলগুলোর আছে একটি লিমিট, একটি গন্তব্য।

অন্তরকের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। নিউটন ও লিবনিজ ভাগ করেছিলেন শূন্য দিয়ে। কিন্তু আধুনিক গণিতবিদরা ভাগ করেন শূন্যের খুব কাছাকাছি একটি সংখ্যা দিয়ে। ফলে তাঁদের ভাগ সম্পুর্ণ বৈধ। কারণ এত নেই কোনো শূন্য। তারা লিমিট নেন। অন্তরক পেতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের বর্গকে শূন্য ধরে নেই করে ফেলা ও শূন্য দিয়ে ভাগ করার কূটকৌশলের আর দরকার নেই (দেখুন পরিশিষ্ট গ)। এ যুক্তিকেও নিউটনের যুক্তির মতোই মনে হতে পারে। তবে বাস্তবে তা নয়। গাণিতিক যুক্তির কঠোর নীতি এটা মেনে চলে। লিমিটের ধারণার পেছনে আছে দৃঢ় ও সঙ্গতিপূর্ণ ভিত্তি। লিমিটকে সংজ্ঞায়িত করার অন্য উপায়ও আছে। যেমন একে দুটি সংখ্যার অভিসার ধর্ম হিসেবে দেখানো যায়। lim sup ও lim inf। (এর দারুণ একটি প্রমাণ আছে। তবে এ বইয়ের ছোট পরিসের সেটা উল্লেখ করলাম না।) অতএব অন্তরকের মাধ্যমে লিমিটকে প্রকাশ করতে কোনো অসুবিধা নেই। এর মাধ্যমে ক্যালকুলাস শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেল।

শূন্য দিয়ে ভাগ দেওয়ার প্রয়োজন ফুরোল। গণিতের জগৎ থেকে বিদায় নিল মরমিবাদ। আবারও জয় হলো গণিত ও যুক্তির। শান্তি টিকল ফরাসি বিপ্লবের রেইন অব টেরর বা ভয়কালীন শাসনামল পর্যন্ত।

তথ্যনির্দেশ

১। স্ববিরোধী বক্তব্য বা দেখতে এক আসলে আরেক এমন জিনিসকে প্যারাডক্স বলে। যেমন, কেউ বলল, "আমি মিথ্যাবাদী।" তাহলে কি লোকটি আসলে মিথ্যাবাদী নাকি সত্যবাদী? এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন লেখকের বই *অসীম সমীকরণ*।

২। নিউটনের বয়স তিন বছর হলে তার মা আবার বিয়ে করে আলাদা হয়ে যান। এরপরে তাদের সাথে তাঁর আর দেখা হয়নি। না না, হয়েছে। যেদিন নিউটন তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে ভেতরে রেখেই পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়ে আসেন।

৩। দুটি সংখ্যার গুণফল শূন্য হলে তাদের একটি বা দুটিই শূন্য হবে। গাণিতিক ভাষায় বললে, ab = 0 হলে হয় a = 0 বা b = 0 হবে। এর মানে হলো a2 = 0 হলে a = 0 হবে।

৪। এ নিয়মের উদাহরণ দেখুন নিচের উদাহরণে।

এমনিতে এ লিমিটের মান ০/০ আসে, যা অনির্ণেয় ও অর্থহীন। হোপিটালের নিয়ম থেকে এর মান পাওয়া যায়। লিমিটের অর্থ হলো ফাংশনের মান আসলে কোন দিকে যাচ্ছে তা বোঝা। এ ফাংশনে x-এর মান (-২) এর দিকে যেতে থাকে ফাংশনটা যেতে থাকবে (-১) এর দিকে। হোপিটালের নিয়ম মান পাওয়া সহজ করে দিল।

চিত্র ২৮.১